ইস্টিশন
প্রকাশনা
Dhrubok
shaitan
শয়তান
সম্পাদনা
Dhrubok

শয়তান

সম্পাদনা

ধ্রুবক

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.blog

শয়তান

সম্পাদনা

ধ্রুবক

© ধ্রুবক
এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

প্রথম ইবুক প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ২০২০

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: ধ্রুবক

ইবুক তৈরি
ধ্রুবক

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Shaitan, Edited by Dhrubok

Istishon eBook
First eBook Published in **February, 2020**
Created by: Dhrubok

উৎসর্গ:

সেই সকল চিন্তাশীল শয়তান-দের নামে,
যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির কাছে ঈশ্বর মিথ সমাপ্ত প্রায়।

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

উৎসর্গ: **০৪**

সূচিপত্র: **০৫**

শয়তানী ভূমিকা: **০৬**

ইসলামী শয়তান: **০৭**

শয়তান কি?: **১২**

শয়তানের জন্ম ও বিবর্তন: **১৭**

ইবলিস শয়তান: **২৪**

শয়তানের জবানবন্দি: **৩০**

নারদ শয়তান: **৪৮**

মিথের শয়তান: **৫১**

শেষ পৃষ্ঠা: **৬৯**

শয়তানী ভূমিকা

আব্রাহামিক ধর্মমতে শয়তান একটি মজাদার চিন্তাশীল উপাদান; একক সৃষ্টিকর্তার আপাত মন্দ কাজের দায়ভার এড়াতে, ধর্ম শুরুর প্রারম্ভেই শয়তান নামক মিথের জন্ম দেওয়া হয়েছে। একজন বিশ্বাসী মানুষ কোনো রকম প্রাথমিক যুক্তি জ্ঞান ছাড়াই শয়তান উপাখ্যানে আস্থা রাখেন এবং শয়তানের ওপর তার মন্দ কাজের দায়ভার চাপিয়ে সুখবোধ করেন; কথায় বলে, "**উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে**" না চাপালে মানুষ নামক প্রাণীটির মস্তিস্ক শান্ত হয় না!

শয়তান মিথের ধর্মতাত্ত্বিক উৎপত্তি নিয়েই এই ইবুকটির জন্ম; এই সংকলনে আব্রাহামিক ধর্মমতের শয়তানকে এমনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যা আপনার চিন্তার অন্ধকারে থাকা শয়তানকে চিনতে সাহায্য করবে।

ধ্রুবক

ফেব্রুয়ারী, ২০২০

ইসলামী শয়তান

আবু ইয়াদ

শয়তান কে? শয়তান বলে কি বাস্তবে কিছু আছে? নাকি এটা একটা নিছক কল্পনা? নাকি সমাজে প্রচলিত কোন গাল-গল্প? মূলতঃ এটা মুসলিমদের আকীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জ্বিনকে বিশ্বাস করা অদৃশ্যে বিশ্বাসের একটি অংশ; এবং একজন মুসলিমের ঈমান পূর্ণতা পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এই অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস করে। যদিও এই অদৃশ্য বিষয় তার বুদ্ধিমত্তা বা চিন্তার সাথে খাপ খায় না। জ্বিনের অস্তিত্ব কোরআন শরীফ ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ্ বলেন: "আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি" **[আয যারিয়াত: ৫৬]**

"বলুন: আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে অতঃপর তারা বলেছে আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি।" **[আল-জিন: ১]**

"অনেক মানুষ অনেক জ্বিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।" **[আল-জ্বিন: ৬]**

মহানবী (সঃ) বলেন: "তিন ধরনের জ্বিন রয়েছে: "একদল, যারা সর্বদা আকাশে উড়ে বেড়ায়, আরেকদল যারা সাপ ও কুকুরের আকার ধারণ করে থাকে এবং

তৃতীয়দল পৃথিবীবাসী, যারা কোন এক স্থানে বাস করে বা ঘুরে বেড়ায়।” **[বায়হাকী ও তাবারানী]**

শয়তান সম্পর্কে আহল-আল-সুন্নাহ এর বিশ্বাস:

শয়তান হলো জ্বিন। আল্লাহ বলেন: “আর আদমকে সেজদা করার জন্য সকল ফেরেশতাকে বলা হলো। সকলেই সেজদা করল। একমাত্র ইবলিস ব্যতীত। সে ছিল জ্বিনদের অন্তর্ভূক্ত। সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হলো...” **[সূরা আল কাহফ: ৫০]**

আর জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজাতির পূর্বেই এক ধোঁয়াহীন আগুন হতে, আল্লাহ বলেন: “এবং জ্বিনকে এর পূর্বেই সৃষ্টি করেছি গনগনে শিখা থেকে।” **[হিজর: ২৭]**

তাই মানবজাতির পূর্বেই জ্বিনের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং তাদের একমাত্র দায়িত্ব হলো আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা। মানুষের মতই জ্বিনদের চিন্তার স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা আছে। এবং তাদেরকে কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আদম (আঃ) সৃষ্টির পূর্বে জ্বিনদের আবাসস্থল ও জীবন প্রণালী কেমন ছিল সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানি না। যেহেতু আল্লাহ্‌ এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কোরআনে কিছু বলেননি তাই এটা আমাদের নিকট তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

আদম (আঃ) এর সৃষ্টি:

জ্বিনের পরই আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির মধ্যে আদম (আঃ) হলেন সর্বশেষ সৃষ্টি। ইবনুল কায়্যিম তাঁর ‘আল-ফাওয়াইদ’ গ্রন্থে আদম (আঃ) কে সর্বশেষে সৃষ্টির করার পেছনে দশটি কারণ দেখিয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে:

- আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের জন্য উপযুক্ত আবাসস্থল থাকতে হবে।
- মানুষের জন্যই বাকী সকল কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।
- একজন দক্ষ কারিগর তার সৃষ্ট কর্মের পরিসমাপ্তি তেমন নিখুঁতভাবেই করেন, যেমন ভাবে তিনি এর সূচনা করেছিলেন।
- আল্লাহ্ তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (কোরান), শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর (হযরত মুহাম্মদ সঃ) শ্রেষ্ঠ জাতি (মহানবীর (সঃ) উম্মত) সর্বশেষেই পাঠিয়েছেন। এমনকি ইহকালের চেয়ে পরকালই শ্রেয়তর। অনুরূপে আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে সর্বশেষে তৈরি করেছেন।

সকল জ্বিন ও ফেরেশতা আদম (আঃ)-কে সেজদা করল একমাত্র ইবলিস ব্যতীত:

আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পর আল্লাহ্ সকল ফেরেশতা ও জ্বিনকে আদম (আঃ) কে সিজদা করতে বললেন। এখানে লক্ষণীয় যে, এর দ্বারা আদম (আঃ) এর ইবাদত করতে বলা হয়নি বরং এর দ্বারা আল্লাহ্র আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। কারণ সেজদা করবার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ দিয়েছেন। একমাত্র ইবলিস ব্যতীত সকলেই নির্দেশ পালন করল। এই ঘটনা কোরআন শরীফে ৭ বার উল্লিখিত হয়েছে, যেমন:

“আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সেজদা কর। তখন সবাই সেজদা করেছে: কিন্তু ইবলিস ব্যতীত। সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ্ বললেন: স্বয়ং আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি তখন কিসে তোকে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল: আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। (আল্লাহ) বললেন: এখান থেকে তুই যা। এখানে তোর অহংকার করার কোন অধিকার নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভূক্ত। সে বলল: আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

আল্লাহ্ বললেন: তোকে সময় দেয়া হলো। সে বলল: যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক হতে, পিছনের দিক থেকে, ডান ও বাম দিক হতে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না।” **[আরাফ : ১১-১৭]**

অর্থাৎ ইবলিস ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল যে সে আদম (আঃ) অপেক্ষা শ্রেয়তর। এমনকি ইবলিস আল্লাহ্‌র ওপর দোষারোপ করে বলল “যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন”। তার ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে জেনে সে মানবজাতিকে বিপথে পরিচালনা করার অনুমতি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেল। সে এটা স্পষ্ট ঘোষণা করল যে সে প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবজাতিকে বিপথে পরিচালিত করবে। আর এই বিষয়টিকেই আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করব।

জান্নাত হতে আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও ইবলিস বহিষ্কৃত হলো ও পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটল:

জান্নাতে আদম ও হাওয়ার (আঃ) কাছে ইবলিস এসে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাবার জন্য প্ররোচিত করল এবং তাঁরা এই ফাঁদে পা দিলেন। আল্লাহ্ তখন তাদের উভয়কেই (আদম, হাওয়া) পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন।

“তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের (আদম ও ইবলিস) শত্রু। তারপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আয়াতসমূহ এসেছিল। অতঃপর তুমি

সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।” **[ত্বোয়াহা: ১২৩: ১২৬]**

এরপর আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন যে, আদম (আঃ) ও তার বংশধরদের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকতে হবে। তাদের শত্রু শয়তান ও তার সাথীরাও পৃথিবীতে অবস্থান করবে। শয়তান মানবজাতিকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রেখে পাপ, মিথ্যা, শিরক ও অন্যান্য কাজ, দ্বীনকে না জানা, সঠিকভাবে পালন না করা ইত্যাদিতে লিপ্ত রাখবে।

শয়তানের উদ্দেশ্য:

শয়তান হলো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহ্ বলেন: “হে বনী আদম। আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” **[ইয়াসীন: ৬০]**

আল্লাহ্র এটা অশেষ দয়া যে তিনি মানুষকে শয়তানের উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ও এর থেকে পরিত্রাণের উপায় বাতলে দিয়েছেন। শয়তানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন: “শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তার অনুসারীদের আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।” **[ফাতির: ৬]**

অর্থাৎ আল্লাহকে অবিশ্বাস, শিরক ও বিভিন্ন পাপ কাজের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলে দেয়। শয়তানের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: “তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয় তখন শয়তান বলে: তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্ তা’আলাকে ভয় করি।” **[হাশর: ১৬]**

শয়তান কি?

আরজ আলী মাতুব্বর

শয়তানের সহিত কোন মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও তাহার নামটির সাথে যথেষ্ট পরিচয় আছে। 'শয়তান' – এই নামটি এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে যে, হাটে, মাঠে, কোর্ট-কাছারীতে, দোকান, স্কুল-কলেজ, ওয়াজের মাহফিল ইত্যাদির সর্বত্র এবং নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, এমনকি অনেক হিন্দুও 'শয়তান' নামটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ, কেহ, এমনও বলিয়া থাকেন যে, "ব্যাটা ভারী শয়তান"।

'শয়তান' কথাটির ধাতুগত অর্থ যাহাই হউক, উহাকে সমাজের যাবতীয় দুষ্কর্মের কারক হিসাবেই লোক ব্যবহার করিতেছে।

ধর্মাধ্যায়ীগণ বলিয়া থাকেন যে, শয়তান পূর্বে ছিল 'মকরম' বা 'ইবলিস' নামক বেহেস্তবাসী একজন প্রথম শ্রেণীর ফেরেস্তা এবং অতিরিক্ত মুসল্লি। মকরম সেখানে খোদাতালার হুকুমমত আদমকে সেজদা না করায় 'শয়তান' আখ্যা পাইয়া চিরকাল মানুষকে অসৎ কাজের প্ররোচনা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া পৃথিবীতে আসে এবং সে অদ্যাবধি নানাবিধ উপায়ে অসৎ কাজে প্ররোচনা বা দাগা দিয়া বেড়াইতেছে।

আদম ও বিবি হাওয়াকে দাগা দিয়াছিল শয়তান একা। কিন্তু আদমের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শয়তানেরও কি বংশবৃদ্ধি হইতেছে? না হইলে দাগাকাজ সুচারুরূপে চলে কি রকম?

কেহ কেহ বলেন যে, শয়তানেও বংশবৃদ্ধি হয় এবং উহা মানুষের চেয়ে দশগুণ বেশী। কারণ প্রতিগর্ভে সাধারণত মানুষ জন্মে একটি, আর শয়তান জন্মে দশটি করিয়া। তাহাদের নাম হয় যথাক্রমে – জ্বলিতন, ওয়াছিন, নফছ, আওয়াম, আফাফ, মকার, মহুদ, দাহেম, ওল-হান ও বার। ইহারা ক্ষেত্রবিশেষে থাকিয়া বিশেষ বিশেষ দাগাকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অধিকন্তু ইহাদের মানুষের মত মরণ নাই। কেয়ামতের দিন মানবজাতি যখন কায় পাইবে তখন ইহাদের মৃত্যু ঘটিবে।

জন্ম-মৃত্যুর ঠেকাঠুকিতেও বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষ টিকিয়া আছে প্রায় তিনশ কোটি। আর মানুষের চেয়ে দশগুন বৃদ্ধি পাইয়া শয়তানের সংখ্যা কত? আদম হইতে আজ পর্যন্ত যত লোক জন্মিয়াছে তাহারা যদি সকলেই জীবিত থাকিত, তাহা হইলে লোকসংখ্যা যত হইত, বোধ হয় যে, কোন ভাষার সংখ্যা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যাইত না। পৃথিবীতে বর্তমানে শয়তানের সংখ্যা তাহারই দশগুণ বেশী নয় কি? ইহাতে মনে হয় যে, পৃথিবীর জলে, স্থলে ও বায়ুমন্ডলে শয়তান গিজগিজ করিতেছে এবং প্রতিটি মানুষের পিছনে লাখ লাখ শয়তান দাগা দিয়া বেড়াইতেছে।

এত অসংখ্য শয়তান মানবসমাজকে পাপের পথে অহরহ প্ররোচিত করিতেছে, কিন্তু শয়তানের সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাইলেও অসৎকাজের মাত্রা ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে না, বরং মানবিক জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অসৎকাজের মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। এখনও দেখা যায় যে, শিক্ষিতের সংখ্যা ও শিক্ষায়তনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। ন্যায়নিষ্ঠ সাধুপুরুষদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। লন্ডন শহরে নাকি এমন দোকানও আছে, যেখানে বিক্রেতা নাই। অথচ ক্রেতাগণ উচিত মূল্য দিয়াই জিনিসপত্র ক্রয় করিতেছে। আবার কোন রকম হারান জিনিস প্রাপ্ত হইয়াও কেহ তাহা আত্মসাৎ করে না। বরং লন্ডন ট্রান্সপোর্ট

লস্ট প্রপার্টি অফিসে উহা জমা দিয়া থাকে, সেখান হইতে জিনিসের মালিক তাহা ফেরত পাইয়া থাকে। সেখানে কি শয়তান কম?

ধর্মপ্রচারকদের বর্ণনা শুনিয়া মনে হয় যে, ফেরেস্তাগণ সবাই নপুংসক। মকরমও তাহাই ছিল 'লানত' বা অভিশাপ প্রাপ্তির সময়ও মকরম একাই ছিল এবং নপুংসক ছিল। তৎপর তাহার বংশবৃদ্ধির জন্য লিঙ্গভেদ হইল কখন? শুধু ইহাই নহে, শয়তানের বংশবৃদ্ধি সত্য হইলে, প্রথমত তাহার ক্লীবত্ব ঘুঁচাইয়া পুংলিঙ্গ গঠনান্তে একটি স্ত্রী-শয়তানেরও আবশ্যক ছিল। বাস্তবিক কি শয়তানেও স্ত্রী আছে? আর না থাকিলেই বা তাহার বংশবৃদ্ধির উপায় কি?

'শয়তানের দাগা' বলিতে কি শুধু রোজা-নামাজের শৈথিল্যই বুঝায়, না চুরি, ডাকাতি, বদমায়েশী, নরহত্যা ইত্যাদিও বুঝায়? যদি যাবতীয় অসৎকার্য শয়তান কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হয়, তবে জাতিভেদে অসৎ কাজের মাত্রাভেদ হয় কেন? অর্থাৎ, যে কোন দেশের সম্প্রদায়সমূহের জনসংখ্যার অনুপাতে অপরাধী বা কারাবাসীর সংখ্যা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের মধ্যে কারাবাসীর সংখ্যাধিক্য কেন?

জীবজগতে দেখা যায় যে, মাংসাশীগণ উগ্রস্বভাববিশিষ্ট এবং নিরামিষাশীরা শান্ত। গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস-মোরগ, কবুতর, ইত্যাদি প্রাণী মাংসাশী নহে, ইহারা শান্ত। অথচ ব্যাঘ্র, সিংহ, শৃগাল, কুকুর, কাক, চিল ইত্যাদি প্রাণীকূল মাংসাশী এবং উগ্রস্বভাববিশিষ্ট। এ কথাও স্বীকার্য যে, স্বভাবের উগ্রতায় নানা প্রকার অঘটন ঘটিয়া থাকে। ইহাও দেখা যায় যে, মানব সমাজের ভিতর যে জাতি অতিরিক্ত মাংসাশী, সেই জাতির মধ্যেই অতিরিক্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল গর্হিত কাজের উৎপাদক কি শয়তান, না মাংস আর উত্তেজক মসল্লা?

বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন দেশের মানুষ মাংসাশী হইয়াও বেশ শান্ত-শিষ্ট ও সংযমী। ইহার কারণ এই নয় যে, সে দেশে শয়তানের উপদ্রব কম বা সে দেশের মাংসে উত্তেজনাশক্তি নাই। ইহার কারণ এই যে, এইরূপ কোন জাতি নিরক্ষাঞ্চলের অধিবাসী নহে। অধিকাংশই হিমাঞ্চলের বাসিন্দা। দেশের শীতকালই তাহাদের স্বভাবের উগ্রতা প্রশমিত করিয়া রাখে।

সুধীগণ বলেন যে, মানুষের মধ্যে ছয়টি আধ্যাতিক শত্রু আছে। উহারা ষড়রিপু নামে পরিচিত। যথা = কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। ইহাদের তাড়নায় মানুষ নানাবিধ অসৎকাজ করিয়া থাকে। যে কোন উপায়ে হউক, ইহাদিগকে দমন করিতে পরিলে মানুষ নিষ্পাপ হইতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সভ্যতার ঊষালোক পইবার পূর্বে আহার-বিহারে মানুষ ও ইতর জীবের মনোবৃত্তির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সে সময়ের মানুষের মন ছিল কৃত্রিমতাহীন, সরল ও স্বাধীন। তখন মানুষ তাহার যে কোন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারিত। তখন প্রবৃত্তিই ছিল মানুষের যথাসর্বস্ব। জ্ঞান উন্মেষের সাথে সাথে মানুষ প্রথম দলবদ্ধ ও পরে সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতে শুরু করে। এই দল বা সমাজকে রক্ষা করিতে আবশ্যক হইল ত্যাগ ও সংযমের। আদিতে এই ত্যাগ ও সংযম ছিল স্বেচ্ছাধীন। ক্রমে যখন সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাহার দল বা সমাজের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য সংযমকে বাঁধিল নীতি ও নিয়মের শৃঙ্খলে। ইহাতে মানুষের সেই স্বাধীন প্রবৃত্তিগুলিকে সু ও কু – এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সু প্রবৃত্তিগুলিকে স্বাধীনই রাখা হইল, কিন্তু কু প্রবৃত্তিগুলিকে করা হইল কারারুদ্ধ। কারাবাসী কুপ্রবৃত্তিগুলিকে মনের অন্ধকার কারাকক্ষে ঘুমাইয়া রহিল। মনের যে অংশে সেই রুদ্ধপ্রবৃত্তি বাস করে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহাকে বলা হয় অচেতন মন বা নির্জ্ঞান মন (Unconscious Mind)।

মানুষ তাহার জাতিগত জীবনের হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন অচেতন মন স্বরূপ মূলধন (উত্তরাধিকার সূত্রে) লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যে সকল অশুভ কামনা সমাজের নীতি, ধর্মের বিধান ও রাষ্ট্রের শাসনের ভয়ে চরিতার্থ করিতে পারে না, তাহাও ক্রমে বিস্মৃতির অতুলগর্ভে ডুবিয়া গিয়া অচেতন মনে স্থান লয়। অচেতন মনে রুদ্ধপ্রবৃত্তিগুলি সময় সময় জাগ্রত হইয়া কারারক্ষীকে ফাঁকি দিয়া বাহিরে আসে এবং সুপ্রবৃত্তিগুলিকে যে শক্তি অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে কারারক্ষী (Censor) বলা হয়। কারাবন্দী কুপ্রবৃত্তিগুলি সময় সময় জাগ্রত হইয়া কারারক্ষীকে ফাঁকি দিয়া বাহিরে আসে এবং সুপ্রবৃত্তিগুলির সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদিগকে বিপথে চালিত করে। ইহা হইতে মানব সমাজের যত কিছু বিড়ম্বনা। মানুষের যাবতীয় অশুভচিন্তা ও অসৎকাজের উদ্যোক্তা এই অচেতন মন।

এতদ্বিষয় পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যাবতীয় অসৎকাজের উদ্যোক্তা মানুষের অভ্যন্তরীণ রিপুসমূহ, বাহিরের কিছু নয়। তবে কি মানুষের কু-প্রবৃত্তিগুলিকেই শয়তান বলা হয়, না মানবদেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট শয়তান-এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়?

শয়তানের জন্ম ও বিবর্তন

রাজেশ তালুকদার

শয়তান এক রোমাঞ্চকর ভীতি জনক ধর্মীয় চরিত্র। যার সরব উপস্থিতির কেন্দ্র বিন্দু আসমানী কিতাবের পাতায় ও কিতাব বিশ্বাসীদের আবদ্ধ মনে সীমাবদ্ধ। ধর্ম বোদ্ধাদের কাছে শয়তান সব রকম মন্দ কাজের প্রতীক। বেহেস্ত থেকে মনুষ্যকুলকে বিতারিত করার চক্রান্তকারী, ভাল মানুষকে করে বিপথগামী, নরক রাজ্যে মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার উৎস, এক কথায় ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্কের ফাটল ধরাতে দিন রাত্রি বিরামহীন গতিতে কাজ করে যাওয়া যেন শয়তানের একমাত্র পেশা।

শয়তান শব্দটি এসেছে হিব্রু শব্দ স্যা-টান(sa-tan) থেকে যার আভিধানিক অর্থ “শত্রু”। আদম ও ঈভকে “জ্ঞান বৃক্ষের” ফল খাওয়ানোর অপরাধে স্বর্গ থেকে বিতাড়নের পর তার নাম হয় “স্যাটান”(satan)। Old testament থেকে New testament যুগে এসে শয়তান সম্পর্কিত ধারনা ও শয়তানি ক্ষমতার ব্যাপক রদবদল হয়েছে। Old testament উৎপত্তি হয়েছে খ্রীষ্ট পূর্ব ১৫০০-৪০০ বছর আগে প্রায় ৩৯ টি বইয়ের সমন্বয়ে যা লিখিত হয়েছে মূলত হিব্রু ভাষায় এবং কিছু

আরামায়িক(Aramaic) ভাষায়। প্যালেষ্টাইন অঞ্চলের আমজনতার ভাষা ছিল এই Aramaic। অপর দিকে গ্রীক ভাষায় New testament লিখিত হয়েছে ২৭ টি বইয়ের সমন্বয়ে। ইহুদি দার্শনিক আলেকজেন্ড্রারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বহু খাটা খাটুনি করে আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব ২৫০ বছর আগে ৭০ মতান্তরে ৭২ জন অনূবাদক ১২ দলে ভাগ হয়ে OT হিব্রু থেকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদের কাজটি করতে গিয়ে OT কে তারা Historical, Poetic এবং Prophetic এই তিন ভাগে করে এতে অনেক কিছু সংযোজন বিয়োজন করেন অত্যন্ত সর্তকতার সাথে। হিব্রু থেকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে এখানে শয়তান অবর্তিন হয়েছে Devil রূপে। Devil শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ Diabolos থেকে। অর্থ “শত্রু” বা “প্রতিপক্ষ” হলেও অর্থগত দিক থেকে Satan অপেক্ষা Devil অনেক ওজনদার অর্থাৎ বেশী মন্দ ধারনার অধিকারী। Devil সরাসরি ঈশ্বরের অবাধ্য, ঈশ্বরের প্রতি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিকারি ও মানুষের শত্রুরূপে বিবেচিত। এছাড়াও শয়তানকে ডাকা হয় অরো অনেক নামে যেমনঃ- Lucifer, Dragon, Serpent, Beelzebub, Abaddon ইত্যাদি। ইসলামে শয়তানের নাম রাখা হয়েছে “ইবলিশ”, ইসলামে “ইবলিশ” চিত্রিত হয়েছে ঈশ্বরের পরে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ক্ষমতাধর ব্যক্তি চরিত্রে।

এই শয়তানের সাথে মানুষের পরিচয় কিভাবে হল সে ইতিহাস জানতে হলে ঐতিহাসিকদের মতে আমাদের পিছাতে হবে খ্রীষ্টের জন্মেরও অনুমানিক ২০০০ বছর আগে। যখন প্রাচীন ইরান আক্রান্ত হয়েছিল ইন্দো-ইউরোপিয়ান “কুরগান”(kurgan) জাতি দ্বারা। এদের আবাস স্থল ছিল রাশিয়ার দক্ষিন কোনে। খাদ্য ও উন্নত জীবন জীবিকার খোজে বিপুল সংখ্যক কুরগান জাতি মধ্য প্রাচ্য ও ইউরোপে ক্রমাগত বসতি গড়ে নিজেদের অবস্থান মজবুত করে নেয়। “কুরগানরা” ছিল বহুদেবতায় বিশ্বাসী। তাদের আচরিত ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল “ভেদাস”।

পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে যে কুরগানরা বসতি স্থাপন করেছিল কালক্রমে পরিবর্তনের হাওয়ায় তারা পরিচিতি পায় সেল্টিক (Celtic) জনগোষ্ঠি নামে।

স্থানীয়দের সাথে মিলে মিশে একাকার হওয়ায় নীরবে তাদের ধর্মে আসে ব্যাপক পরিবর্তন; নতুন ধর্মীয় মত হয় "ড্রুয়িডিজম" (Druidism)।

আর যে সব "কুরগান" মধ্যপ্রাচ্যে বসতি গড়ে তুলেছিল প্রবাহমান সময়ের স্রোতে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে ঘটে যায় যুগান্তকারী নাটকিয় পরিবর্তন। যুক্ত হয় মানুষ মরার পরে মৃত ব্যক্তির আত্মার "পাপ মোচন" ও "নরক দন্ড" ভোগের নব দুই ধারা। এই বিশ্বাস মতে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আত্মাকে অবশ্যই ঘোড়ায় চড়ে পার হতে হবে একটি খুবই সরু সাঁকোর উপর দিয়ে। তাদের দেবতা "রাশু" (Rashu) দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করবেন প্রত্যেক আত্মার সাঁকো পার হওয়ার চলমান ও কম্পমান পতনের দৃশ্য। পুন্যআত্মারা সাঁকো অনায়াসে পার হয়ে স্বর্গে পৌঁছতে পারলেও পাপী আত্মারা সাঁকো থেকে পিছলে পড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত জলন্ত অগ্নি কুন্ডে(নরকে)।

ইতিহাসবিদদের দাবি, এরাই প্রথম কৃত কর্মের ফল অনুসারে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আত্মা নামক এক পরম সত্বার স্বর্গ-নরক গমন ধারনার ধর্মীয় দিগন্তের সূচনা করে। তাদের বিশ্বাস দেবতা "রাশু" শুভ শক্তি। তাঁর পক্ষে মানুষকে কোন প্রকার অন্যায় বা পাপ কাজে সহযোগীতা করা সম্ভব নয়। তাহলে কেন মানুষ অন্যায় বা পাপ কাজ করে? কে ভালো মানুষকে প্রলুব্ধ করে পাপ বা অন্যায়ের পথে টেনে নিয়ে যায়? এর জন্য দায়ী কে বা কোন অদৃশ্য শক্তি? এই আপাত দুরূহ প্রশ্ন গুলোর একটি গ্রহনযোগ্য সমাধান খুজতেই ধীরে ধীরে কল্পিত হতে শুরু করে মন্দ বা পাপের প্রতীক কোন এক বিশেষ শক্তির। কিন্তু তখনো শয়তান চরিত্রটি আজকের মত এত শক্তিশালী পূর্নাঙ্গ চরিত্র নিয়ে জন্ম লাভ করেনি।

আনুমানিক ৬২৮ থেকে ৫৫১ খৃস্টপুর্বে পারস্যে (বর্তমান ইরানে) জন্ম লাভ করা পয়গম্বর জরোয়াস্টার (Zoroaster) শয়তানের ধারনাটিকে আরেকটু স্বচ্ছ অবয়ব দান করার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচারিত মতবাদটি পরিচিতি পায় মাজদাবাদ

(Mazdaism) নামে। তিনি তাঁর প্রচারিত ধর্মে আধাত্মিকতা বাদে অনেক নতুন ধারা সংযোজিত করেন। ধর্মীয় ইতিহাসে প্রথম এক ঈশ্বরবাদী ধার্মের প্রবক্তা হিসাবেও তাকে বিবেচিত করেন ইতিহাসবিদরা। তৎকালীন সমাজে পূজিত বরুণ, মিত্রা ও ইন্দ্রকে পূজা করতে অস্বীকার করে পরিবর্তে শুরু করেন তাঁর সৃষ্ট সর্ব ক্ষমতার অধিকারী, স্বর্গ মর্ত্যের সৃষ্টিকারী আহুরা মাজদা (Ahura Mazda) নামে এক শুভ পুরুষ দেবতার পূজা। জরোয়াষ্টারের মতে আহুরা মাজদার আরেক জমজ ভাই হল আহরিমান (Ahriman)। যিনি হলেন মন্দের দেবতা। পৃথিবীতে যত খারাপি আছে সব কিছুর স্রষ্টা এই আহরিমান।

আহুরা মাজদা ও আহরিমানের মধ্যে আদর্শিক দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠায় শুরু হয় বিরোধ। বিরোধ গড়ায় যুদ্ধে। জরোয়াষ্টার বিশ্বাস করতেন তাদের এই যুদ্ধ ক্রমাগত চলতেই থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না খারাপ দেবতা আহরিমান পরাজিত হয়। মাজদাবাদে আছে শেষ বিচার নামে এক বিচার ব্যবস্থা যেখানে মৃত মানুষদের আত্মাকে কর্ম অনুযায়ি দুই ভাগে ভাগ করা হবে। যারা ভাল কাজ করবে তাদের প্রাপ্তি স্বর্গ আর যারা খারাপ কাজ করবে তারা ভোগ করবে অনন্তকাল নরক যন্ত্রনা ।

ইতিহাসবিদদের ভাষ্য মতে মাজদাবাদের লেজ ধরেই এক ঈশ্বরবাদী ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পরিশেষে ইসলামের জন্ম।

জি মেসান্ডির (G.Messande) মতে খৃষ্টপুর্ব ৫ম শতাব্দি থেকে খৃষ্টপুর্ব ৫৩ সনের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে ইহুদিরা মাজদাবাদের অনেক কিছু আত্মসাৎ করে। তার মধ্যে আত্মা অবিনশ্বর, স্বর্গীয় দেবতা ও শয়তানের ধারনা অন্যতম।

প্রাচীন ইস্রাইলে প্রথম দিকে গড়ে ওঠা হিব্রু ধর্মীয় মতানুসারে ভালো ও মন্দ উভয় কাজ সব্যসাচী রূপে পরিচালনা করতেন তাদের ঈশ্বর জেহোবাহ (Jehovah)। শয়তানকে তখনো ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ রূপে উপস্থাপনের কোন চেষ্টা না করে বরং সর্ব

ক্ষমতা ও একক সিদ্ধান্তের অধিকারী ঈশ্বর জেহোবার ইচ্ছানুসারে সব কিছু ঘটত বলে বিশ্বাস করা হত।

Isaiah 45:6-7

I am the LORD and there is none else. I from the light and create darkness. I make peace and create evil. I the Lord do all things. (KJV)

Lamentations 3:37-38

Who has commanded and it came to pass, unless the Lord has ordained it? It is not from the mouth of the Most High that good and evil come?

প্রমাণ হিসাবে আরো উল্লেখ করা যায় সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী প্রলয়ংকরি বন্যায় নোয়ার নৌকা ভাসানোর হিব্রু গল্প। বন্যায় জান, মাল ও সম্পদের যত ধ্বংস ও ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল সবটাই ঘটেছিল ঈশ্বরের ইচ্ছাতে।

Old testament যুগের প্রারম্ভিক দিকেও ধর্মে শয়তানের কোন ভুমিকা নেই। এখানে ঈশ্বরই সর্বেসর্বা অর্থাৎ কর্তার ইচ্ছা কর্ম। সে যুগের মানুষের চেষ্টা ছিল ঈশ্বরকে ইনিয়ে বিনিয়ে সব সময় তুষ্ট রাখার অপ্রাণ চেষ্টা করা। ঈশ্বর প্রসন্ন থাকলেই দেশ সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে কেবল ভালো বা শুভ পরিস্থিতি বিরাজ করবে আর কোন কারনে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হলেই মানুষের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ ধেয়ে আসে এটাই ছিল সে যুগের প্রচলিত বিশ্বাস। OT পঞ্চম খন্ডকে বলা হয় “ডিউটারনমি” (Deuteronomy)। এখানে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতার কিছু নমুনা বর্নিত আছে-

The LORD will send on you curses, confusion and rebuke in everything you put your hand to, until you are destroyed and

come to sudden ruin because of the evil you have done in forsaking him. The LORD will plague you with diseases until he has destroyed you from the land you are entering to possess. The LORD will strike you with wasting disease, with fever and inflammation, with scorching heat and drought, with blight and mildew, which will plague you until you perish. (Deuteronomy 28:20-23)

মানুষকে শারীরিক মানসিক নির্যাতন চালাতেই যেন ঈশ্বরের যত আনন্দ। অথচ ঈশ্বর সব সময় কল্পিত হয়ে এসেছে শুভ প্রতীক রূপে মানুষের রক্ষাকর্তার ভূমিকায়। OT তে ঈশ্বরের বর্ননা দেখে মনে হয় শয়তান এখানে ঈশ্বরের চেয়ে ঢের ভালো। অসহায় মানুষের উপর শয়তান কখনো এত বর্বরতার সুযোগ নেয় নি।

হিব্রু বাইবেলের সংকলিত কয়েকটি বইয়ের মধ্যে "জব" (Job) অন্যতম। জব কখন কোথায় লিখিত হয়েছিল সে সম্পর্কে রয়েছে প্রচুর মতানৈক্য। লেখকের নামও অজানা। তারপরেও হিব্রু বাইবেলে জবকে একটি শিক্ষনীয় ও পবিত্র বই হিসাবে গন্য করা হয়। হিব্রু বাইবেল মতে পূর্ব প্যালেইষ্টাইনে জন্ম গ্রহন করা জব ছিলেন ধনশালী, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যবান, পরোপকারী, পরিশ্রমী, মোটের উপর একজন আদর্শ পুরুষ। যিনি সারা জীবন ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও স্মরণ করে গেছেন অবলীলায়। তাই জব পরিগনিত হয়ে গেলেন ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র হিসাবে। কিন্তু জবের ঈশ্বর প্রীতি শয়তানের একদম সহ্য হল না। কুটিল শয়তান চক্রান্ত করে ঈশ্বরকে পরার্মশ দিল জব ঈশ্বরকে আদৌ সত্যিকার অর্থে কোন ভক্তি শ্রদ্ধা করে কিনা তা একবার বাজিয়ে দেখার। শয়তানের কথা ঈশ্বরের মনে ধরল, শুরু করলেন নির্দয় কঠিন পরীক্ষা। ঈশ্বর শয়তানকে আদেশ করলেন প্রথমে তার ছেলেমেয়েদের হত্যা করার, তার সমস্ত ধন সম্পদ ধ্বংস করার, শেষে জবকে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত করার। অসীম মানসিক নির্যাতনে নিস্পেষিত ও অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগের পরেও জব

ঈশ্বরের প্রতি কোনরূপ গালমন্দ বা দোষারোপ করলেন না। তার ঈশ্বর ভক্তিতে সামান্য ফাটল দেখা গেল না কোথাও। পরীক্ষায় পাস করলেন জব। খুশি হলেন ঈশ্বর। এই হল জবের কাহীনি। যা দীর্ঘ পদ্য আকারে লেখা আছে হিব্রু বাইবেলে। এই গল্পের নৈতিক শিক্ষা হল শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রতিটি মানুষের কর্তব্য ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখা কারন ঈশ্বর সব সময় আপনার পরীক্ষা নিচ্ছেন।

"One day the divine beings presented themselves before the LORD, and the Satan (Heb: ha-satan) came along with them. The LORD said to the Adversary, 'Where have you been?' Satan answered the LORD, 'I have been roaming all over the earth.' The LORD said to Satan, "Have you noticed my servant Job?" –Job 1:6-8

জবে শয়তানের অনুঃপ্রবেশ ঘটলেও আমাদের কাছে দিবা লোকের মত পরিষ্কার ঈশ্বরের অনুমতি ছাড়া অর্থব শয়তানের শয়তানি করার বিন্দু মাত্র ক্ষমতা ছিল না। অনান্য দেবতার মত সেও ছিল অত্যন্ত উচ্চ পদ সম্পন্ন একজন ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ বাধ্য দেবতা। যে ঈশ্বরের ইশারা ছাড়া একক সিদ্ধান্তে কোন খারাপ কাজে পা বাড়ানোর অধিকার রাখত না।

Satan can not perform any acts unless God approves (Job 1:6 to 2:10) ---------------**অসমাপ্ত!**

ইবলিস শয়তান

আহমেদ উল্লাহ ভূইয়া

জ্বীনদের ৫ম বাদশাহ হামুচের পুত্র খবিচের ঔরসে এবং তার কন্যা নিলবিসের গর্বে ইবলিসের জন্ম। খবিচ ছিল সিংহের মতো শক্তিশালী এবং স্বভাব ছিল বাঘের ন্যায়। নিবলিচ ছিল ভীষন ধূর্ত। হিংসুক ও নিষ্ঠুর প্রকতির। ইবলিস ছিল অসাধারণ প্রতিভাবান, খুবই সুদর্শন, সাহসী, শক্তিশালী এবং এক ঘুঁয়ে। ইবলিসের গৃহ শিক্ষক ছিল শারবুক- যার ছিল ২৬ হাজার বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। ইবলিসের মত মেধাবী ছাত্র তার শিক্ষা জীবনে কোথাও পায়নি। তবে সে খবিসকে বলেছিল, ছেলের প্রতি খেয়াল রেখ। সে জীবনে বিরাট কিছু একটা হবে।

সময়ের বিবর্তনে জ্বীনদের নোংরা আচরনে অসন্তুষ্ট হয়ে মহান আল্লাহ পাক হামুচের বংশ ধ্বংস করার নির্দেশ দান করলে ফেরেস্তারা তাই করেন। তবে ইবলিসের দেহ বর্ণ এবং জ্ঞানের গভীরতা দেখে তাকে ফেরেস্তারা রেখে দেয়। সহসাই ইবলিস তার আচরনে ফেরেস্তাদের মন জয় করে। ফেরেস্তারা ইবলিসকে ‘খাশেন’ নামক সনদ দিলেন। যার অর্থ মহাজ্ঞানী। এরপর ফেরেস্তাগণ তাকে আসমানে তুলে নিলেন। দ্বিতীয় আসমানে ইবলিসের ইবাদত বন্দেগীতে একাগ্রতা দেখে ফেরেস্তাগণ মুগ্ধ হয়ে তাকে ‘আবেদ’ সনদ দান করলেন। এরপর তার উন্নতি

ঘটে তৃতীয় আসমানে। প্রতি আসমানেই তাকে একহাজার বছর ইবাদত করতে হতো এবং সে তাই করতো। এভাবে সে ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম আসমানে পোঁছে। এবাদত বন্দেগীতে একাগ্রতার উৎকর্ষের সাথে সাথে তার ‘ওলী’, সালেহ, মুত্তাকী, খাজিন, রুহুল্লাহ ইত্যাদি সনদ মিলে। ইবলিস ফেরেস্তাদের ওয়াজ-নছিহত করতো। ফেরেস্তাদের গণতান্ত্রিক আবেদনে আল্লাহপাক ইবলিসকে আরশে মুয়াল্লায় তুলে নেন। ইয়াকুত পাথরে নির্মিত সুউচ্চ মিম্বরে বসে সে এবাদত বন্দেগী করতো এবং ফেরেস্তাদের মাঝে ওয়াজ নসিহত করতো। সে লাভ করে “মুয়াল্লিমুল মালাকুত” বা ফেরেস্তাদের শিক্ষক নামক খেতাব।

এভাবে ছয় হাজার বছর কেটে গেল। ইতোপূর্বে পাপী জ্বীনদের ধ্বংস করার সময় কিছু সংখ্যক সৎ চরিত্রের জ্বীন পাহাড় পর্বতে আশ্রয় গ্রহন করে মহান আল্লাহ পাকের ইবাদতে মগ্ন থেকে জীবন রক্ষা করেছিল। এতদিনে এসব ভালো জ্বীনদের বংশধরদের দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হয়ে যায়। আর এসব জ্বীনদের ভালোভাবে হেদায়েত করার জন্য পৃথিবীতে আসার নির্দেশ দান করেন। ইবলিস দরখাস্ত করলো যে সে সারা দিন পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশে কাজ করবে বটে, তবে রাতে যেন আরশে মুয়াল্লায় আল্লাহ পাকের ইবাদতে রাত যাপনের সদয় অনুমতি দান করেন। আল্লাহ পাক তার দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। ইবলিস আরশে মুয়াল্লায় ইবাদতের পাশাপাশি ফেরেস্তাগণকেও কোচিং করান; সৎ উপদেশ দান করেন। তবে পৃথিবীর জ্বীনরা ইবলিসের উপদেশাবলী উপক্ষো করে যার যার রুচিবোধ অনুযায়ী চলতে লাগলো। তাই ইবলিস রাগান্বিত হয়ে আল্লাহ পাকের নিকট জ্বীনদের ধ্বংস করার জন্য আবেদন করলো। কথা হলো ইবলিস জ্বীনদের হেদায়েতের জন্যও আল্লাহ পাকের নিকট আবেদন না করে ধ্বংসই প্রার্থনা করলো। ইবলিস জ্বীন ও ফেরেস্তোদের একচ্ছত্র নেতা বনে গেল। তাছাড়া আসমান ও জমিনে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ইবলিসের সেজদা পড়েনি। তাই আল্লাহ পাকের নিকট তার কোন দরখাস্তই নামঞ্জুর হয়নি।

এরই মাঝে ইবলিসের লওহে মাহফুজ দর্শনের ইচ্ছা জাগ্রত হলো। আবার দরখাস্ত মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট। মঞ্জুরও হলো। হযরত মিকাঈল (আঃ) এর উপর দায়িত্ব পড়লো তাকে লওহে মাহফুজ ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য। লওহে মাহফুজে রয়েছে সৃষ্ট মানুষ, ফেরেস্তা ও জ্বীনদের ভাগ্যলিপি তথা কর্মফলের রেজিষ্টার। ইবলিস দেখলো আল্লার এক সৃষ্ট দাস বা বান্দা একাধারে ছয়লক্ষ বছর ইবাদত করার পরও আল্লাহর একটি মাত্র আদেশ অমান্য করার অপরাধে অভিশপ্তে রূপান্তরীত হয়ে বেহেস্ত হতে বিতাড়িত হবে। স্পষ্ট লিখা রয়েছে, "লানা তুল্লাহি আলাল ইবলিস" – অর্থাৎ ইবলিসের উপর অভিশাপ বর্ষিত হোক। ইবলিস তখনও জানতো না কে সে অভিশপ্ত বদমায়েশ। কারণ সে নিজকে সবচে' পূণ্যবান ভাবতো। আর এ দেখে সে আল্লাহ পাকের নিকট এক সেজদায়ই ছয় হাজার বছর কাটিয়ে দেয়।

আল্লাহর সকল আদেশ, নির্দেশ পালন, বিদ্যাবুদ্ধি, অর্জিত জ্ঞান ইবলিসের হৃদয়ে অহমিকার জন্ম দেয়। নিজকে ভাবতে থাকে যে কোন সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নিজকে ভাবতে থাকে আসমান এবং জমিনের সকল জ্বীন ও ফেরেস্তাদের অবিসংবাদিত নেতা। যেহেতু আল্লাহ সৃষ্ট জ্বীন ও ফেরেস্তারা সবাই তাকে মান্য করে। তাই আল্লাহ পাকও তার নিকট প্রতিযোগিতায় হেরে যাবেন। তাছাড়া জ্বীন ও ফেরেস্তাদের সেই প্রধান শিক্ষা গুরু। ইবলিস মনে মনে ভাবতে লাগলো, যে কোন সময়ে সে আল্লাহ পাকের অধীনতা হতে স্বাধীনতা ঘোষনা করার ক্ষমতা রাখে। ইবলিস তার জনগন অর্থাৎ জ্বীন ও ফেরেস্তাদের বুঝাতে চাইলো- সেই সর্বময় ক্ষমতাধারী। অথচ জ্বীন ও ফেরেস্তাগণ আল্লাহ পাকের সার্বিক ক্ষমতাকে স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে বললে, ইবলিস হেসে উড়িয়ে দেয়। ইবলিসের ধারনা তার জনপ্রিয়তার কাছে আল্লাহর কোন শাস্তিই কার্যকর হবে না।

আল্লাহপাক বার বার খারাপ জ্বীনদের সৎপথে আনার জন্য তাদের মধ্য হতে সৎ এবং ধার্মিক বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। বার বারই জ্বীন সম্প্রদায় কালের আবর্তনে পাপে, ব্যভিচারে, হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে। জ্বীনদের প্রথম বাদশা

চালপলিশ ছত্রিশ হাজার বছর জ্বীনদের উপর বাদশাহী করেছেন। এরপর বাদশা বিলিকা এবং বাদশাহ হামুচ বাদশাহ হয়েছেন। এরা ছিলেন সৎ, ন্যায় পরায়ন। অথচ জ্বীনরা তাদের মাঝে হানাহানি ও বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত ছিল। এতো সুকঠিন এবং ন্যায়ানুগ বাদশাহদের স্বজনদের মাঝেও খারাপ জ্বীনেরা জঘণ্য অপরাধে লিপ্ত হতো।

বাদশাহ হামুচই ছিলেন জ্বীনদের সর্বশেষ বাদশাহ। তারই জঘন্য প্রকৃতির ছেলে খবিস এবং নোংরা চরিত্রের কন্যা নিলবিছের সন্তানই প্রতিভাধর ইবলিস। বিরক্ত হয়ে আল্লাহ পাক আদম সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আদম (আঃ) কে তৈরী করার জন্য আজরাঈল (আঃ) কে মাটি সংগ্রহ করতে বললেন। আজরাঈলের সংগৃহীকৃত পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মাটি হতে কাবার মাটি দিয়ে আদম (আঃ) মস্তক, বেহেস্তের মাটি দিয়ে চোখ, ভারত উপমহাদেশের মাটি দিয়ে হাত এবং পূর্বদেশের মাটি দিয়ে দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরী করলেন। তারপর সে দেহকে আল্লাহ পাকের আরশে নীচে নিভৃত জায়গায় শুইয়ে রাখলেন। ফেরেস্তাগণ শায়িত আদম (আঃ) এর নিষ্প্রান দেহ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা তা ইবলিসকে বলল। ইবলিশ আদম (আঃ) এর দেহ দেখে পরীক্ষা করে আশ্চর্য হলেও ফেরেস্তাদের বুঝতে দিলনা। শুধু বললো মানুষ দিয়ে আল্লাহর খিলাফত চলবেনা। সুতরাং ভাববার কিছু নেই।

এরপর মহান আল্লাহ পাক আদম (আঃ) এর শরীরকে নিপূন সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করলেন এবং প্রান সঞ্চার করলেন। ফেরেস্তাদের বললেন সেজদা করে সম্মান জানাতে। সবাই তাই করলো কিন্তু ইবলিশ সেজদা করতে অস্বীকার করলো। সে বললো মরনশীল মাটির তৈরী মানুষকে সে সেজদা করবেনা। তারপর আল্লাপাক তাকে আসমান থেকে বের করে দিলেন এবং বললেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইবলিসের উপর আল্লাহর অভিশাপ থাকবে। ইবলিস তদ্দিন পর্যন্ত তার সাজা মওকুপ রাখার জন্য অনুরোধ করলো অর্থাৎ বেঁচে থাকার প্রার্থনা জানালে আল্লাহ তা কবুল করেন।

শুধু তাই নয় তার প্রার্থনার লিষ্টে যোগ করলো মুসলমানদের নামাজের সময়- তার বাদ্য বাজানোর অধিকার, অশ্লীনগান গাওয়ার ও নৃত্যের অধিকার এবং মানুষকে ভুল পথে চলার মন্ত্রনাদানের অধিকার। আদম (আঃ) শয়তানের শয়তানীর ভয়ে ভীত হলে, আল্লাহ পাক তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, “তুমি ভয় পেওনা। মানুষকে সৎ পথে চলার এবং শয়তানের ধোকা হতে আত্মরক্ষার জন্য আমি তোমার বংশধরদের বিধি বিধান সম্বলিত কিতাব নাযিল করবো এবং নির্দেশিত পথে চালাবার জন্য নবী ও রাসূল প্রেরন করবো। আমার বিধান মতো চললে তাদের বিপথ গামী হওয়া বা অভিশপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। তারা ইবলিশের ধোকা হতে রক্ষা পাবে।” মহান আল্লাহ পাক বেহেস্ত হতে ইবলিসকে বিতাড়িত করলেন। তবে মানব সমাজে ইবলিসের বিচরন সর্বত্র। আর মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ইবলিস যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করে, তা হলো লোভ, উত্তেজক গানবাজনা, নাচ, চটুল বাক্যালাপ, ক্ষমতার মোহ, নারীদেহ, সম্পদের লোভ, লালসা, নেশাদ্রব্য, অহংকার, অভিনয়, মিথ্যাচার, পরহিংসা, জিঘাংসা ইত্যাদি।

শয়তান মানুষকে রিপূর উপাসকে পরিনত করে, পরনিন্দায় উৎসাহিত করে, অন্যের অকল্যানে একজনকে অপরের বিরোদ্ধে প্রভাবিত করে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ফুলিয়ে পাাঁপিয়ে মহান আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে নিতে উৎসাহিত করে। পার্থিব সুখ আর জৌলশ মুখী করে রাখে মানুষকে। আর যারা তা হতে নিজকে রক্ষা করতে পারে তারাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আ’লামিনের রহমতের মালিক হয়। পুরস্কৃত হয়। পরকালীন সুখ তথা বেহেস্তের নিশ্চয়তা তাদেরই রয়েছে- যারা আল্লাহর বিধানকে জীবনাচারে প্রতিফলিত করে। আর শয়তান ও তার তাবেদারদের পৌত্রিক সম্মত্তি জাহান্নাম। আর সে সংসদের সংসদীয় দলের নেতা হবে খবিসের বেটা ইবলিস।

ইবলিস কাহিনী মানব জাতির জন্য চাক্ষুস উদাহরন। যার বিবেক আছে সেই বুঝতে পারে বাদশাহ হামুচের ছেলে মেয়ের ঘরে জন্মালেও তার মা-বাবা ছিল নিষ্ঠুর, কুচক্রি এবং দুশ্চরিত্র। সুতরাং অপাত্রে জন্ম হলে তার কার্যাবলীও সুন্দর এবং

সার্বজনীন হয় না। কালের আবর্তনে জাতক জন্মদাতা ও জন্ম দাত্রীর চরিত্রকেই অনুসরন করে থাকে। অহংবোধ মানুষের অধঃপতনের কারন। তাই ইবলিসের ছয় লক্ষ বছরের ইবাদতের পরিনতি জাহান্নাম। অপরের ক্ষতির চিন্তা এবং চেষ্টা একজন মানুষকে কোন নরকে নিয়ে যেতে পারে ইবলিস তার জ্বলন্ত উদাহরন। সুতরাং হে মানুষ, সাবধান! জ্বীন ও ফেরেস্তাকুলের প্রভাবশালী নেতা ইবলিসের জীবন হতে আসুন শিক্ষাগ্রহন করি। মানুষ হই। আল্লাহ আমাদের সংপথ প্রদর্শন করুন এবং আমরা তা মেনে চলতে সংকল্পবদ্ধ হই।

শয়তানের জবানবন্দি

আরজ আলী মাতুব্বর

বোশেখ মাস, আকাশ পরিষ্কার, বায়ু স্তর। রাতটি ছিল অতি গরমের। বৈঠকঘরের বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি; ঘুম আসে না গরমে। মনে হয় যেনো জাহাজে বয়লারের কাছে শুয়েছি অন্যত্র জায়গা না পেয়ে। মনটা ছোটাছুটি করছে তাপের লেজ ধরে কল্পনাজগতের নানা পথে। ভাবছি তাপ দুপ্রকার – কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক। কৃত্রিম তাপ কমানো যায়, বাড়ানো যায়, নতুবা তাপের উৎস থেকে দূরে সরে যাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক তাপের বেলায় সবসময় তা পারা যায় না। আজকের এ তাপের উৎস হচ্ছে সূর্য। যার স্থানীয় তাপমাত্র ৬০০০ হাজার ডিগ্রী (সে) এবং দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। শোনা যায় যে, দোজখের আগুনের তাপ নাকি সে আগুনের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী। অর্থাৎ ৪,২০,০০০ ডিগ্রী (সে) এবং তা হবে মানুষের কাছে দূরত্বহীন। কেননা সে আগুনের ভিতরেই নাকি থাকতে হবে তাবৎ বিধর্মী বা অধার্মিক মানুষকে। তা-ও আবার দশ-বিশ বছর নয়, অনন্তকাল। মানুষের এহেন কষ্টভোগের কারণ নাকি একমাত্র শয়তান। তাই বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেই শয়তানের উপর অত্যন্ত ক্ষ্যাপা।

শয়তান নাকি পূর্বে ছিলো 'মকরম' নামে একজন প্রথম শ্রেণীর ফেরেস্তা এবং অত্যন্ত মুছল্লি। সে নাকি এতই খোদাভক্ত ছিলো যে, জগতে এতটুকু স্থান বাকি নেই, যেখানে তার সেজদা পড়েনি। কিন্তু আল্লাহতালার হুকুম মোতাবেক নাকি বাবা

আদমকে সেজদা না করায় তার ফেরেস্তার পদ ও মর্যাদা নষ্ট হয়। তাই সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বাবা আদম ও তার বংশাবলীকে দাগা অর্থাৎ অসৎকাজে প্ররোচনা দিয়ে নাকি দোজখী বানাচ্ছে। সামান্য পদমর্যাদা হানির বিনিময়ে গোটা আদম জাতির অগণিত মানুষের দোজখবাসের কারণ হয়ে থাকলে শয়তান তো মানুষের সাধারণ শত্রু নয় – মহাশত্রু, পরমশত্রু, মহাপরমশত্রুই বটে। শয়তানের স্বভাব-চরিত্র, কার্যকলাপ ও বাসস্থান সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে শেষরাত্রে গরমটা কিছু কমে যাওয়ায় আরাম বোধ করতে লাগলাম এবং মনের ভাবনাগুলোও স্তিমিত হলো। এ সময় শুনতে পেলাম, কে যেন কোমল কণ্ঠে মৃদুস্বরে আমাকে দরজা থেকে ডাকছে।

আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম আগন্তুক আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সে এক সৌম্য মূর্তি। পরনে সাদা পাজামা, গায়ে সাদা জুব্বা, মাথায় (লেজওয়ালা) সাদা পাগড়ী এবং বুক ভরা সাদা দাড়ি, সুঠাম সুডৌল তেজোদীপ্ত চেহারা। তাঁর চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছে আনন্দ ও বুদ্ধির জ্যোতি। জীবনে এমন মানুষ কখনো দেখিনি, কোনরূপ আবেগ উৎকণ্ঠ নেই, নতুন স্থান বলে নেই কোন কিছু নিরীক্ষণের প্রয়াস। এখানের পথঘাট, গাছপালা ও ঘরবাড়ি যেনো তার সবই চেনা। ভাবলাম, লোকটা আলেম তো হবেনই, মুছল্লিও বটেন। কিছু দূরে থাকতে তিনি আমাকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানালেন, কাছে গেলে করমর্দন করলেন। আমি আমার বৈঠকঘরে প্রবেশ করে একখানা চেয়ার দেখিয়ে সসম্প্রমে তাঁকে বললাম – বসুন জনাব।

আগন্তুকটির পরিচয় জানার আগ্রহ নিয়ে আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে তিনি তা যেনো বুঝে ফেললেন এবং আমাকে বললেন, "আমার পরিচয় জানতে চান? আমার পরিচয় আপনি ভালো করেই জানেন। আর আপনি একাই নন, আমার পরিচয় সকল মানুষই জানে এবং ভালোভাবেই জানে। কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত আমাকে দেখেনি, দেখেননি আপনিও। পৃথিবীর জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সবখানে আমার অবাধ

গতি। আমি সকল মানুষের সাথেই মেলামেশা করতে চাই, চাই ভালোবাসা করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার সাথে কেউ মেলামেশা করতে চায় না। আমার মাতাপিতা নেই; ছিলোও না কোনোদিন। আমি আল্লাহতালার নূরে তৈরী, কুদরতে সৃষ্টি, জন্মসূত্রে আমার নাম ‘মকরম ফেরেস্তা, পরে ইবলিশ এবং হাল নাম শয়তান।"

আগন্তুকের নামটি শুনে আমি ভড়কে গেলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, তার সাথে আমি কি কথা বলবো এবং কিভাবে বলবো। কোনো বিষয় কিছু ভাবতে সাহস হচ্ছে না। কেননা তিনি যেনো আমার মনের ভাবনাগুলোও দেখতে পাচ্ছেন। স্থির করলাম – কিছু ভাববো না, বলবো না কিছু নীরব-নিশ্চিন্তে শুনে যাব শুধু, যা বলবার তিনিই বলুন। এখন সমস্যা হলো যে আগন্তুককে সম্মান প্রদর্শন করবো কি করবো না। তবে বেশ-ভূষায় তো সম্মানের পাত্রই বটেন।

আমার মৌনভাব দেখে আগন্তুক যেনো আমার মনের কথা সমস্তই বুঝতে পারলেন এবং অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, “যে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মুরব্বি বলা হয় এবং সভাসভ্য তাবৎ মানুষ জাতির মধ্যেই মুরব্বি ব্যক্তি সম্মানের পাত্র। মানুষের মধ্যে কারো কোনো মুরব্বি ব্যক্তির বয়সের জ্যেষ্ঠতা সচরাচর দশ-বিশ কিংবা পঞ্চাশ-ষাট বছর, কদাচিৎ একশ'। কিন্তু আপনাদের আদি পিতা আদম যখন সৃষ্ট হন, আমি তখন বেশ সেয়ানা এবং আজো বেঁচে আছি। সুতরাং বয়সের হিসাবে শুধু আপনারই নয়, আমি সমস্ত মানুষ জাতির মুরব্বি।

“আল্লাহ সর্বাগ্রে ফেরেস্তা বানিয়েছেন, পরে জীন বানিয়েছেন এবং সর্বশেষে বানিয়েছেন আদমকে। ইসায়ীরা সৃষ্টিকর্তাকে ‘পিতা বলেই সম্বোধন করে থাকে। কাজেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে আদমকে আমার ভাইও বলতে পারি, তবে বয়সে কনিষ্ঠ। আপনাদের সমাজে বা মানব সমাজে কারো কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম (সেজদা) করবার রীতি আছে কি? হয়তো নেই। তা হলে আদমকে সেজদা না করে আমি নীতিবহির্ভূত কাজ করিনি, করেছি আল্লাহতালার আদেশ লঙ্ঘন। কিন্তু আদেশ যিনি

করেছেন, তা লঙ্ঘন করার শক্তিও তিনিই দান করেছেন। জগতে কারো এমন কোনো শক্তি নেই, যার সে শক্তি দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাশক্তিকে পরাস্ত করে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে কার্যকরী করতে পারে। আল্লাহ জানতেন যে, আমি তাঁর হুকুমে আদমকে সেজদা করবো না, আদম তাঁর নিষেধ মেনে গন্ধম খাওয়া ত্যাগ করবে না এবং আদমের আওলাদরা তাঁর আদেশ-নিষেধ কেউ মানবে, কেউ মানবে না। তা না জানলে তিনি আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বে, বিশেষত আমাকে শয়তান বানাবার পূর্বে বেহেস্ত-দোজখ নির্মাণ করলেন কি করে, কি জন্য?

“আমি লাখো লাখো বছর আল্লাহকে সেজদা করে এসেছি, এখনো করি। আমি বেঁচে থাকতে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করবো না, এ কথা তিনি জানেন এবং তিনি নিজেও বলেছেন, "আমাকে ভিন্ন অন্য কাউকে সেজদা করো না। আল্লাহর আসনে অন্য কাউকে বসালে তাতে তার গৌরব বাড়ে কি-না, তা তিনিই বোঝেন। তথাপি তিনি আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেস্তাদের হুকুম করার কারণ — এটা তার লীলা অর্থাৎ অন্তরের বাণী নয়।

“আল্লাহ সাতটি দোজখ বানিয়েছেন, সবগুলোতে মানুষ থাকার জন্য। তিনি কি চান যে, আমি আমার দাগাকাজ বন্ধ করি, আর তার দোজখগুলো খালি থাক? তা তিনি চান না, চাইতে পারেন না। চাইলে তাঁর দোজখ বানাবার সার্থকতা ক্ষুন্ন হয়। আল্লাহর ইচ্ছা যে, কিছুসংখ্যক মানুষ দোজখবাসী হোক। আর আমাকে বলেছেন তার সেই ইচ্ছা পূরণে সহায়তা করতে। এ কাজ আমার পক্ষে করা ফরজ, না করা হারাম।

“আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না, কেউই পারে না। বহু চেষ্টা করেও কোনো নবী-আম্বিয়া, দরবেশকে আমি দোজখবাসী করতে পারিনি। কেননা তাঁরা দোজখবাসী হোন, তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। পক্ষান্তরে হজরত ইব্রাহিম নমরুদকে, হযরত মুসা ফেরাউনকে এবং শেষ নবী (দ:) আবু জেহেলকে হেদায়েত

করে বেহেস্তের তালিকায় নাম লেখাতে পারেননি আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। কেননা তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়।

"আপনারা মনে করেন যে, আল্লাহর যতো সব রহমত মানুষের উপরই বর্ষিত হয়। বস্তুত তা নয়। আল্লাহর রহমত আমার উপর অনেক বেশী মানুষের তুলনায়। আদমকে সৃষ্টি করার কতো লাখ বছর পূর্বে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তা তিনিই জানেন। অথচ আল্লাহর রহমতে আমি আজও বেঁচে আছি। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে মাত্র ৬০, ৭০ কিংবা ১০০ বছর। তদুপরি শিশুমৃত্যু-অপমৃত্যু যথেষ্ট। আমার সুদীর্ঘ জীবনে আজ পর্যন্ত আমি কোনোরূপ রোগ, শোক বা অভাব ভোগ করিনি, আল্লাহর রহমতে। কিন্তু মানুষ অসংখ্য রোগ, শোক ও অভাবে জর্জরিত। ফেরেস্তারা আমাকে লক্ষ্য করে তীর ছেড়েন আবহমান কাল থেকে। অথচ আল্লাহর রহমতে আমি নিরাপদেই থাকি। কিন্তু তাতে (বজ্রপাতে) ধ্বংস হয় সবকিছু মরে মানুষ। পবিত্র মক্কায় গিয়ে হাজী সাহেবরা আবহমানকাল আমায় লক্ষ্য করে পাথর ছোড়েন। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তা আজ পর্যন্ত আমার গায়ে পড়েনি একটিও। অথচ সমুদ্রে জাহাজ ডুবে অসংখ্য হজযাত্রী মারা যান, আল্লাহর রহমতে।

"আল্লাহর রহমতে আমি নিমেষে বিশ্বভ্রমণ করতে পারি, অদৃশ্যকে দেখতে, শ্রবণাতীতকে শুনতে, নিজে অদৃশ্য থেকে অন্যের মনের খবর জানতে। দুদিন অনিদ্রা-অনাহারে থাকলে মানুষ ঝিমিয়ে-নেতিয়ে পড়ে। আর আমি লাখ লাখ বছর ধরে অনিদ্রা-অনাহারেও সুস্থসবল আছি, সে তো আল্লাহর রহমতেই। বলা যাবে যে, মানুষ তো ওর অনেক কিছুই আয়ত্ত করে ফেলেছে। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, রেডিও, টেলিভিশন, রকেট ইত্যাদি যন্ত্র দিয়ে মানুষ এখন অদৃশ্যকে দেখছে, শ্রবণাতীতকে শুনছে, আকাশে-পাতালে ভ্রমণ করছে, অনাহারে বেঁচে থাকার গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং কেউ তো অন্যের মনের ভাবও জেনে নিচ্ছে টেলিপ্যাথির সাহায্যে। এসব মানুষ আয়ত্ত করছে সত্য, হয়তো আরো অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করবে। কিন্তু সে সমস্ত যারা করেছেন ও করবেন, তাঁরা তো আমারই শিষ্য।"

"কোনো মানুষের অকল্যাণ আমার কাম্য নয় এবং তা করিও না। পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে এমন কতোগুলো বিধি-নিষেধ রয়েছে, যা মানুষের অকল্যাণই করে এসেছে আবহমান কাল থেকে। তাই মানুষের কল্যাণ কামনায় সে সব বিধি-নিষেধ অমান্য করার জন্য আমি মানুষকে প্রেরণা ছি। কেননা সেসব বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করার জন্য মানুষকে প্রেরণা দেওয়াই আমার কাজ। আর তারই ফল আধুনিক জগতে মানব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ক্রমোন্নতি। তথাকথিত ধর্মগ্রন্থগুলোতে আকাশতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য যাবতীয় তত্ত্বালোচনাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, ঘোষিত হয়েছে স্বর্গ ও নরক-তত্ত্ব, বিশেষভাবে।

"মানুষ আজ সমুদ্রতলে বিচরণ করে, আকাশে পাড়ি জমায়, পরমাণুগর্ভে প্রবেশ করে এবং কতো অসাধ্য সাধন করে, কিন্তু এর কোনোটাই ধর্ম বা ধমীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মানুষকে শিক্ষা দেয়নি, বরং নিষেধ করেছে বারে বারে। আমার কর্তব্য বিধায় ওসব আমিই শিক্ষার প্রেরণা দিয়েছি ও দিচ্ছি মানুষকে, আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। কিন্তু তাতে শুধু অধার্মিকরাই লাভবান হয়নি, ধার্ষিকরাও ভোগ করছেন তার সুযোগ-সুবিধাগুলো পুণ্যার্জনের জন্য। জল, স্থল ও হাওয়াই যানের সাহায্য ছাড়া শুধু পদব্রজে পবিত্র হজ্জব্রত পালনে হাজীদের সংখ্যা কতোজন হতো, তা হিসেব করে দেখেছেন কি? বর্তমানে ওয়াজে, আজানে, পবিত্র কোরান তেলাওয়াতে, জানাজার নামাজেও মাইক, রেডিও, টেলিভিশন ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে পুণ্যের মাত্রা নিশ্চয়ই বাড়ছে। সুতরাং শুধু পাপকর্মের দ্বারা দোজখে যাবার জন্যই নয়, পুণ্যকর্মের দ্বারা বেহেস্তে যাবার জন্যও আমি মানুষকে সহায়তা করছি না কি? এছাড়া আমি হামেশা আল্লাহকে স্মরণ করি, তার হুকুম পালন করি, তাঁর এবাদত করি, কিন্তু দোজখ থেকে পরিত্রাণ বা বেহেস্ত লাভের প্রত্যাশায় তা করি না। কেননা দোজখের শাস্তি ও বেহেস্তের সুখ আমার কাছে অকেজো। যেহেতু নূরের তৈয়ারী দেহ আমার আগুনে জুলবে না এবং আহার-বিহার নিদ্রা ইত্যাদি না থাকায়

(বেহেস্তের) সুখাদ্য ফল, সুপেয় পানীয়, স্বর্ণপুরী, সুদরী ললনা (হুর-গেলমান) ইত্যাদি আমার কোনো কাজেই আসবে না। পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবমাত্রেই আল্লাহর এবাদত করে থাকে। কিন্তু তারাও দোজখের ভয়ে বা বেহেস্তের লোভে তা করে না। অথচ মানুষ তা-ই করে থাকে। ধর্মের নিশানধারীদের মধ্যে হাজারে বা লাখে এমন একজন মানুষ মিলবে কি-না সন্দেহ, যিনি নিছক আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই পুণ্যকাজ করেন, যার সাথে বেহেস্তদোজখের সম্পর্ক নেই। যারা দোজখের ভয়ে বা বেহেস্তের লোভে পুণ্যকাজ করে, তারা আমার চেয়ে অধম, পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট।

"এ যুগের মানুষ আপনি, হয়তো কম্পাস দেখেছেন। ওর কাটার একটা প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর উত্তরে সুমেরুর দিকে এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণে কুমেরুর দিকে স্থির হয়ে থাকে। কেউ ওর ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। নাড়াচাড়া বা জোরজুলুম করে সাময়িকভাবে ওর কিছু ব্যত্যয় ঘটালেও, ছাড়া পেলে কাঁটা স্থির হয় গিয়ে সাবেক বিন্দুতে। কোনো কম্পাসের কাঁটাদ্বয়ের কোন প্রান্ত সুমেরু ও কোন প্রান্ত 'কুমেরু মুখী থাকবে, তা নির্ধারিত হয় তার সৃষ্টিকর্তার (নির্মাতার) দ্বারা তখনই যখনই তিনি কাঁটটিকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ যখন কাঁটাটিকে ধন (পজিটিভ) ও ঋণ (নেগেটিভ) ধর্মী দুটি আলাদা জাতের বিদ্যুতের দ্বারা চুম্বকায়িত করেন। কোনো সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই কম্পাসের কাঁটার দিকপাতনে ব্যত্যয় ঘটাবার, একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা (নির্মাতা) ছাড়া। অনুরূপভাবেই মানুষের মানসরাজ্যেরও 'সু' ও 'কু দুটি মেরু আছে। তবে তাকে মেরু বলা হয় না, বলা হয় প্রবৃত্তি। অর্থাৎ সুপ্রবৃত্তি এবং কুপ্রবৃত্তি। সুপ্রবৃত্তি থাকে বেহেস্তমুখী এবং কুপ্রবৃত্তি থাকে দোজখমুখী হয়ে। মানবমনের এরূপ বৃত্তিবিভাগ করেছেন আল্লাহতা'লা মানবসৃষ্টির বহু পূর্বে। যে সময়টিতে আল্লাহ এ বিভাগ দুটি নির্ধারণ করেছেন, সে সময়টিকে বলা হয় 'রোজে আজল বা 'নিয়তি।

“রোজে আজল-এ নির্ধারিত ফলাফলের বিরুদ্ধে দাগ দিয়ে কোনো মানুষকে আমি দোজখী বানাতে পারি না এবং কোনো ধর্মপ্রচারকও হেদায়েত করে কোনো মানুষকে বেহেস্তবাসী করতে পারেন না। তবে সাময়িক মনের পরিবর্তন ঘটানো যায় মাত্র। কোনো কম্পাসের কাঁটাকে নেড়েচেড়ে বা জোর করে মেরুভ্রষ্ট করা হলে, ছুট পেলে পুনঃ যেমন সাবেক মেরুতে চলে যায়, মানুষের মানসকাঁটাও তদুপই সুমেরুমুখী কোনো মানুষকে দাগ দিয়ে তার দ্বারা আমি অসৎকাজ করাতে পারি, এমন কি তাকে ‘কাফের নামে আখ্যায়িত করাতেও পারি। কিন্তু পারি না তার জীবনসন্ধ্যায় তওবা পড়ে মোমেন হয়ে বেহেস্তে যাওয়া রোধ করতে। অনুরূপভাবেই কুমেরুমুখী কোনো মানুষকে হেদায়েত-নছিহত করে তার দ্বারা কোনো ধর্মপ্রচারক সৎকাজ করাতে পারেন এবং তাকে আখ্যায়িত করতে পারে মোমেন নামে। কিন্তু তিনি পারেন না তার অন্তিম মুহুর্তে ‘বেঈমান হয়ে দোজখে যাওয়া রোধ করতে। এভাবে অনেক সমাজী কাফের বেহেস্তে যাবে। যাবে ‘সমাজী মোমেন দোজখে।

“আল্লাহ যাকে দোজখবাসী করতে চান না, আমি শত চেষ্টা করেও তাঁকে দোজখী বানাতে পারি না। লক্ষাধিক নবী-আম্বিয়াদের প্রত্যেককেই আমি দাগ দিতে চেষ্টা করেছি এবং কিছু কিছু সফলও হয়েছি। কিন্তু আমি কাউকে দোজখী বানাতে পরিনি।

“আমার দাগায় পড়ে তারা সামান্য গুনাহ যা করেছেন, আল্লাহ তার শাস্তি প্রদান করেছেন এ দুনিয়াতেই, পরকালে তাঁরা সবাই থেকেছেন নিষ্পাপ। যেমন– হযরত আদমের বেহেস্ত থেকে দুনিয়ায় নির্বাসন, হযরত ইউনুসের মৎস্যগর্ভে বাস, হযরত আইউবের বিমার, শেষ নবী (দ) এর খাদান শহিদ ইত্যাদি উক্তরূপ পাপেরই শাস্তি।

“আজ পর্যন্ত আমি আল্লাহতালার মাত্র একটি হুকুমই অমান্য করেছি। তাঁর হুকুমে আদমকে সেজদা না করে। আর অন্য কজনও তো তাঁর হুকুম অমান্য করেছে

প্রায় একই সময়, একই জায়গায় থেকে। কিন্তু সেজন্য তিনি রাগ করেননি বা কাউকে কোনোরূপ শাস্তি দেননি। জেবরাইল, মেকাইল ও এস্রাফিল ফেরেস্তাত্রয়কে আল্লাহ হুকুম করেছিলেন পৃথিবী থেকে মাটি নেবার জন্য, আদমকে বানাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু একে একে তিন ফেরেস্তাই আল্লাহর হুকুম খেলাপ করে ফিরে গেলেন তাঁর কাছে খালি হাতে, মাটির অসম্মতির জন্য। অবশেষে আজরাইল ফেরেস্তা আল্লাহর আদেশ মোতাবেক জোরপূর্বক কিছু মাটি নেওয়ায় তদ্বারা আদমকে বানানো হলো। কিন্তু চারবার আদেশ অমান্য সত্ত্বেও আল্লাহ মাটিকে (দোজখের) আগুনে পোড়ালেন না, বরং পানি দিয়ে কাদা বানিয়ে মহানন্দে আদমের মূর্তি বানালেন ও তাতে প্রাণদান করলেন। আর তিন ফেরেস্তা যে তাঁর হুকুম অমান্য করলেন তুচ্ছ মাটির কথা মেনে, তা যেনো তাঁর খেয়ালই হলো না। পক্ষান্তরে তাঁর হুকুম অমন্যের দায়ে আমাকে নাকি দিলেন অভিশাপ, আমার গলায় দিলেন লানতের তাওক এবং নির্বাসিত করলেন বেহেস্ত থেকে দুনিয়ায় চিরকালের জন্য। এসব কি তাঁর পক্ষপাতিত্ব বা ন্যায়বিরোধী কাজ নয়? না, এতে তিনি এতটুকু পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায় করেননি। বরং অন্যায় করেছে মানুষ, তার ইচ্ছে ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে।

“বলা হয় যে, আমি অভিশপ্ত, তিরস্কৃত ও নির্বাসিত হয়েছি। বাস্তবে তার একটিও না। এ বিষয়ে একটু খোলাসা করেই বলি।

“প্রথমত আমি আল্লাহর বিরাগভাজন ও অভিশপ্ত হয়ে থাকলে তিনি আমাকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করতে পারতেন, পারতেন রোগ, শোক, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব ভোগ করাতে, যেমন করেছেন হারুৎ-মারুৎ ফেরেস্তাদ্বয়কে। সর্বোপরি পারতেন মৃত্যু ঘটিয়ে জগত থেকে আমাকে নিশ্চিহ্ন করতে। কিন্তু তিনি তার একটিও করেননি। বরং উল্টোই করেছেন। যদি কেউ কাউকে বলে, ‘তুমি রোগ, শোক, দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করে – তাহলে সেটা কি তার পক্ষে আশীর্বাদ না অভিশাপ? আল্লাহ আমাকে কোনো রোগ দেননি, শোক দেননি, অপমৃত্যু দেননি, কোনো অভাব দেননি, বরং দীর্ঘায়ু দান করেছেন। এসবের মধ্যে অভিশাপ কোনটি?

“দ্বিতীয়ত বলা হয়ে থাকে যে, আমি তিরস্কৃত হয়েছি। অর্থাৎ আল্লাহ আমার কণ্ঠে লানতের তাওক দান করেছেন। এ কথাটিও পুরো ঠিক নয়। আমি "তাওক একটি পেয়েছি ঠিকই। তবে সেটা কাঠের না লোহার না স্বর্ণের তৈরী, কেউ তা দেখেননি বা শোনেননি কারো কাছে আজ পর্যন্ত। ওটা কারাবাসীর কণ্ঠে যেমন তিরস্কার (তাওক), তেমন বিজয়ীর কণ্ঠে পুরস্কার (মেডেল) সূচিত করে। তারতম্য শুধু গঠন ও উপকরণে। এ বিষয় পরে বলবো।

“তৃতীয়ত বলা হয় যে, আমি বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হয়েছি, নির্বাসিত হয়েছি পৃথিবীতে। আল্লাহর আদেশে পৃথিবীতে আসা-যাওয়া অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাঁর নির্দেশিত কর্তব্য তো অন্যান্য ফেরেস্তাগণও পালন করে থাকে। তারাও কি নির্বাসিত? জেবরাইল ফেরেস্তা সংবাদ বহন ও আজরাইল ফেরেস্তা মানুষের জান কবজ করার উদ্দেশ্যে না হয় পৃথিবীতে আসে ও চলে যায়। কিন্তু মিকাইল ফেরেস্তা পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না আবহাওয়া বিভাগের কাজ বন্ধ করে। কেরামান ও কাতেবীন ফেরেস্তাদ্বয় রোজনামচা (ডাইরী) লেখা ছেড়ে দিয়ে মানুষের কাঁধ থেকে এক পা বাইরেই দিতে পারে না এবং মনকির ও নকিরকে তো জীবন কাটাতে হচ্ছে মানুষের কবরে কবরেই পৃথিবীতে। এরা যদি নির্বাসিত বলে সাব্যস্ত না হন, তবে আমি নির্বাসিত হই কোন বিচারে? আমিও তো আল্লাহর আদেশে আমার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি পৃথিবীতে বসে। বরঞ্চ আমি ওদের প্রত্যেকের চেয়ে মুক্ত ও স্বাধীন।

“জেবরাইল ফেরেস্তা সংবাদবাহক। সে আল্লাহর সকালের আদেশ কারো কাছে বিকেলে পৌছাতে পারে না। মেকাইল ফেরেস্তা আবহাওয়া পরিচালক ও খাদ্য পরিবেশক। সে আল্লাহর সকালের আদেশের বৃষ্টি বিকেলে এবং বাংলাদেশের বৃষ্টি আরবদেশে বর্ষাতে পারে না, পারে না ধনীর খাদ্য গরীবকে দান করতে। এভাবে প্রত্যেক ফেরেস্তাই আছে তাদের নিজ নিজ কর্তব্যের নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু আমার কর্তব্য (পরীক্ষা) কাজ সম্পাদনে আল্লাহ আমাকে এরূপ কোনো নিয়মের

শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেননি। আমার পরীক্ষাকাজের সকাল-বিকাল নেই বা শীত-বসন্ত নেই, এশিয়া-ইউরোপ নেই; নেই যুব-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব পার্থক্যের নির্দেশ। বস্তুত আমি বিতাড়িত বা নির্বাসিত নই, অন্যান্য ফেরেস্তাদের মতোই আমি কর্তব্যের খাতিরে প্রেরিত হয়েছি পৃথিবীতে। আমি আল্লাহর মনোনীত ফেরেস্তা — বিশ্ববাসীর বিশ্বাসের পরীক্ষক (একজামিনার)।

"বলা হয় যে, আদমকে সেজদা না করায় আমি ঘৃণিত ও অধঃপতিত হয়েছি এবং আদমকে গন্ধম ভোজন করিয়ে মানুষের শত্রু হয়েছি। বাস্তবে তা নয়। বরং পুরস্কৃত হয়েছি ও পদোন্নতি লাভ করেছি এবং মানবকুলের বন্ধুর কাজই করেছি। আমার কথা শুনে আপনি একটু তাজ্জব হলেন বুঝি। এ বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলি।

"ফেরেস্তারা নূরের তৈরী। তাই পাক-সাফ বটে, তবে ওদের বুদ্ধি নেহাত কম। নিজেরা কোনো কাজই করতে পারে না আল্লাহর হুকুম তামিল করা ছাড়া। হা হুজুর' ছাড়া না হুজুর বলার ওদের অভ্যাস নেই। তবে একদিন না হুজুর' বলেছিলো, কিন্তু তা খাটনি। আল্লাহ পৃথিবীতে মানবজাতি সৃষ্টির পরিকল্পনা ঠিক করে আদমকে বানাবার পূর্বে ফেরেস্তাগণের আক্কেল পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তাতে তারা আল্লাহকে বলেছিলেন, "আদমীরা আপনার হুকুম-আহকাম মানবে না বা এবাদত করবে না। সুতরাং আদম সৃষ্টি না করাই উত্তম। মানবজাতির পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ ফেরেস্তাদের সে উপদেশ অগ্রাহ্য করে আদমকে বানালেন। কিন্তু আল্লাহ যদি ফেরেস্তাদের প্রস্তাব মেনে আদমকে না বানাতেন, তাহলে মানবজাতির এ দুনিয়াস্ত্রীতির কি দশা হতো?

"আদমকে বানিয়ে আল্লাহ ফেরেস্তাদের ডেকে বললেন– তোমরা আদমকে সেজদা করো। আল্লাহর হুকুম পেয়ে সব ফেরেস্তা একযোগে অর্থাৎ জামাতের সহিত এক রাকাত নামাজ আদায় করলেন আদমকে কেবলা করে। কিন্তু আমি সে নামাজ পড়লাম না। আল্লাহর আসনে আদমকে বসিয়ে তাকে সেজদা করতে আমার বিবেক

বাধা দিলো। আমার বিবেক বললো যে, আল্লাহ পরিস্কার ভাষায় বলেছেন, “আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা কোরো না। তবে আজ কেন আদমকে সেজদা করতে বললেন? হয়তো এর কারণ ফেরেস্তাদের আক্কেল পরীক্ষা করা। আল্লাহ দেখতে চান যে, ওদের তুচ্ছ করা আদমকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ফেরেস্তারা সেজদা করতে আপত্তি করে কি-না।

“মনে করুন– কোনো এক ব্যক্তি তার পাচটি ছেলেকে ডেকে জনৈক পথিককে দেখিয়ে বললো, “তোমরা সবাই ওকে বাবা বলে ডাকো। পিতার আদেশ পালন করা কর্তব্য, এ নীতিবাক্যটি পালন করে চারটি ছেলেই সেই পথিককে ‘বাবা বলে ডাকলো। কিন্তু একটি ছেলে ডাকলো না। সে ভাবলো, ‘পিতা কখনো দুজন হতে পারে না। পথিককে বাবা বললে তা হবে মিথ্যে কথা বলা। আর পিতা তো আগেই বলেছেন, কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। আমার মুখে পথিককে বাবা ডাকার মধুর শব্দটি শুনে পিতা খুশী হবার জন্য নিশ্চয়ই এ কথাটি বলেননি, বলেছেন আমাদের আকেল পরীক্ষার জন্য। সুতরাং পিতার এ আদেশটি না মানাই শ্রেয়। এ ভেবে সে ছেলেটি তার জীবনের মহাকর্তব্য (সত্যকথন) পালন করলো, কপট পিতাকে মিথ্যা ‘বাবা ডাকলো না। ছেলেদের পিতা তার চার ছেলের অজ্ঞতা দেখে মনোক্ষ্ম হলেন এবং এক ছেলেকে বিজ্ঞতার পুরস্কার বাবদ তার গলায় দিলেন মেডেল। "আল্লাহ হলেন অন্তর্যামী। মানুষ বা ফেরেস্তা কারো বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখে তিনি তুষ্ট হন না, বিচার করেন মনের। আদমকে সেজদা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ ফেরেস্তাগণের আক্কেলের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। আমি তাতে উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি আমাকে দান করেছেন বিজয়ের একটি নিশানা। কেউ কেউ তাকে বলে আমার পরাজয়ের নিশানা বা লানতের তাওক । বস্তুত আল্লাহ আমাকে দান করেছেন বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ ‘মেডেল।

“বলা হয় যে, আমি আদমের শত্রু, আদম জাতির শত্রু; কেন না গন্ধম ভক্ষণ করিয়ে আমি আদমকে বেহেস্তছাড়া করেছি। আসলে তা নয়। যৌনক্রিয়ায়

নাকি মানুষ নাপাক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বেহেস্ত হলো চিরপবিত্র স্থান। সেখানে ওসব নাপাকীর কোনো স্থান নেই। কাজেই আদম-হাওয়া বেহেস্তে থাকলে তাদের যৌনক্রিয়া আজীবন বন্ধ রাখতে হতো। ফলে আদম থাকতেন নিঃসন্তান ও নির্বংশ। আদমের প্রেমাসক্তি সম্পূরণ ও বংশবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ আদম-হাওয়াকে স্থান দিয়েছেন পৃথিবীতে তাদের বংশবৃদ্ধির গরজে।

"বেহেস্তের মধ্যে তখন তিন জাতীয় ফলের গাছ ছিলো। প্রথমত সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ, এর ফলগুলো ছিলো সাধারণ খাদ্য। অর্থাৎ জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য। দ্বিতীয়ত জীবন বৃক্ষ। এর ফলগুলো ছিলো অমরত্বের প্রতীক। অর্থাৎ পরমায়ুবর্ধক। তৃতীয়ত জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ। অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক। এই জ্ঞানদায়ক ফলটিরই নামান্তর গন্ধম।

"আদমকে যখন বানানো হলো, তখন তিনি ছিলেন নির্জীব মাটির পুতুল এবং আল্লাহ যখন প্রাণদান করলেন, তখন হলেন তিনি সজীব পুতুল। কিন্তু তখনও জ্ঞান বস্তুটি তার মধ্যে ছিলো না মোটেই। এমন কি লজ্জা-জ্ঞানও না। আদম-হাওয়া ছিলেন উলঙ্গ। ইতর প্রাণী ও মানুষের প্রধান পার্থক্য হলো লজ্জাজ্ঞান। আদম-হাওয়ার সেই লজ্জাজ্ঞান জন্মালো গন্ধম ভক্ষণের পর। ক্রমে জন্মালো ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞান গন্ধম ভক্ষণের ফলে। পক্ষান্তরে বিবি হাওয়া হলেন রজস্বলা গন্ধম ছেড়ার ফলে। কাজেই গন্ধম না খেলে হযরত আদম থাকতেন জ্ঞানশূন্য আর বিবি হাওয়া থাকতেন বন্ধ্যা। আদমের জ্ঞান ও বিবি হাওয়ার সন্তানোৎপাদিক শক্তি জমালো গন্ধম খাওয়ার ফলে। সুতরাং গন্ধম খাইয়ে আমি শুধু আদম-হাওয়ারই নয়, তাবৎ মানবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বংশবিস্তারের সহায়তাই করেছি, যা অন্য কোনো ফেরেস্তা করেননি। কার্যত আমি মানুষের পিতার চেয়ে ভক্তির পাত্র এবং গুরুর চেয়ে মান্যবর। দুঃখের বিষয় এই যে, কতক মানুষ তা বাহ্যত মানতে চান না, তবে কার্যত মেনে চলেন। আর তাতেই আমি সন্তুষ্ট কেননা একজন বিশ্বাসী মানুষ দিনেরাতে নানা কারণে যতবার আমার নামটি মুখে উচ্চারণ করেন, মনে হয় যে, ততোবার তার

বাবার নামও উচ্চারণ করেন না। বিশেষত আমার নামটি তাদের প্রাতঃস্মরণীয় ও অগ্রপাঠ্য।

"আপনি ভাবছেন, এ বিরাট পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে দাগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় কিরূপে। আপনার এ ভাবনাটা অমূলক নয়। আসলে ও কাজটা ততো কঠিন নয় আমার পক্ষে। কেননা আমি দুনিয়ার সকল অঞ্চলের সকল মানুষকে দাগ দেই না, দাগ দেই ঈমানদাদিগকে। অর্থাৎ যারা আমাকে বিশ্বাস করে তাদেরকে। আমার উপর যাদের ঈমান নেই, অর্থাৎ আমি আছি বা আমার অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করেন, তারা তো কাফের। কেননা পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন, "শয়তান আছে এবং পবিত্র হাদিছে নবী বলেছেন, "শয়তান আছে। এতদসত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি বলে, "শয়তান নেই, তবে পবিত্র কোরান-হাদিছের বাণী অমান্যকারী সে ব্যক্তি কি কাফের নয়?

“আবার যে ব্যক্তি কাফেরের ঔরসে জন্মলাভ করে, সে তো জন্মসূত্রেই কাফের এবং সে নানাবিধ বেসরা কাজ (মূর্তিপূজা) ইত্যাদি করে থাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার দাগ দেওয়া ছাড়াই। তাকে তার কৃতকর্মে বাধা দানের অর্থ হয় অসৎকাজে অর্থাৎ পাপকাজে বাধাদান করা। আল্লাহ তো কারো অসৎকাজে আমাকে বাধা দিতে বলেন নি। তাই আল্লাহর আদেশ মেনেই আমি কোনো বিধমীকে দাগা দেই না। অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের উপর যাদের ঈমান নেই, তাদের আমি দাগ দেই না, এমনকি তাদের কোনো সৎকাজেও না। তাইতো বর্তমান দুনিয়ায় ঈমানদারদের চেয়ে বেঈমানদারগণই সৎকাজ করেন বেশী।

“আমাকে যেমন সকল মানুষকে দাগ দিতে হয় না, তেমন সকল জায়গায় আমি সমভাবে অবস্থানও করি না। বিশ্বাসীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনা মন্দির ও ধর্মধামেই আমাকে সময় কাটাতে হয় বেশী। কেননা ওগুলোই হচ্ছে আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র। তবে মফস্বলেও কিছু কিছু কাজ না করলে চলে না।

“আপনার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে যে, অহরহ মানুষের সহবাসে থাকা সত্ত্বেও তারা আমাকে দেখতে বা আমার অস্তিত্বই অনুভব করতে পারে না, এর কারণ কি এবং কোথায় বসে আমি মানুষকে দাগ দিয়ে থাকি? তা বলি শুনুন। "আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দান করেছেন মানুষের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে এবং শিরায় । শিরায় চলতে। যখন আমি কোনো ব্যক্তিকে দাগ দিতে চাই, তখন তাকে বাইরে থেকে ডেকে বলি না যে, তুমি এ কাজটি করো না এবং ও কাজটি করো। আমি তখন প্রবেশ করি তার দেহের কেন্দ্রস্থল মস্তিকে এবং মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিন্দু ত্রিতলা মনের একেবারে নীচের তলায়, যে জায়গাটির নাম অচেতন মন বা 'নিজ্ঞান মন। সেখানে বসে আমি তার অচেতন মনকে প্রলুব্ধ করি কোনো কাজ করতে বা না করতে। আমার কর্মকেন্দ্র মানুষের মস্তিকের অভ্যন্তরে অবস্থিত। তাই দুষ্ট লোকেরা বলে টুপির নীচে শয়তান থাকে। তাদের সে কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। কেননা আমার অধিষ্ঠানটি টুপির নীচেই উপরে নয়।

"আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না, কেউ পারে না। আমি যা কিছু করি তদ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকেই পূরণ করি এবং অন্যেরাও তা-ই করে থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, বিশ্বাসীরা তা পুরাপুরি মানেন না। তাঁরা আল্লাহকে বলেন সর্বশক্তিমান, আবার কোনো কাজে আমার উপর দোষ চাপান। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরও বলেন, ‘শুভ কাজের কর্তা আল্লাহতা'লা এবং অশুভ কাজের কর্তা শয়তান।’ যদি তা-ই হয়, তবে "আল্লাহ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বশক্তিমান– এ কথাটির সার্থকতা কি? এতে কি আমাকে ‘আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও দ্বিতীয় শক্তিধর বলে প্রমাণিত হয় না? বস্তুত তা নয়। আমার সমস্ত কাজেই আছে আল্লাহতালার সমর্থন। এখন তাই একটু বলছি।

“বলা হয়, আল্লাহ দুনিয়ার সব কাজ করবার ক্ষমতাই মানুষকে দান করেছেন। কিন্তু হায়াত, মউত, রেজেক ও দৌলত, এ চারটি কাজ রেখেছেন নিজের হাতে। আবার এ কথাও বলা হয় যে, খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতি ও ব্যভিচারের

উদ্যোক্ত শয়তান। তাই যদি হয় অর্থাৎ আমার দাগায় পড়েই যদি কোনো এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে আহত ব্যক্তির জান কবজ করতে আজরাইল ফেরেস্তা সেখানে আসেন কার হুকুমে? সেই দিনটি মৃতব্যক্তির হায়াতের শেষ দিন নয় কি? কলেরা-বসন্তাদি রোগে অসংখ্য মানুষ মরে জীবাণুদের আক্রমনে। সেই জীবাণুদের দাগ দেয় কে?

"সমস্ত জীবের রেজেক (খাদ্য) দান করেন স্বয়ং আল্লাহতালা। চোর-ডাকাতের রেজেক দান করেন কে? মানুষ জানে না যে, আল্লাহ কার রেজেক কার ভাণ্ডারে রেখেছেন। আল্লাহ যার রেজেক ও দৌলত যেখানে রেখেছেন, যে কোনও উপায়েই হোক সেখান থেকে এনে সে তা ভোগ করবেই। চোর চুরি করে বটে, কিন্তু আসলে সে তার আল্লাহর বরাদ্দকৃত খাদ্যই খায়। আমি যদি দাগ দিয়ে চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে একের রেজেক অন্যকে খাওয়াতে পারি, তাতে আল্লাহর গৌরব বাড়ে কি? অন্যান্য জীবের রেজেকও আল্লাহতালাই জোগান। গেরস্ত বাড়ির হাঁস-মোরগ ও খাদ্যাদি চুরি করে শেয়াল-কুকুরে খায়। তাদের দাগ দেয় কে?

"বলা হয় যে, শয়তানের খপ্পরে পড়ে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাতে আল্লাহর কোনো সমর্থন নেই। যদি তাই হয়, তবে জারজ সন্তানের প্রাণদান করে কে? মানব সৃষ্টোত্তর কালে আল্লাহ যখন মানুষের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই তিনি জানেন যে, কোন প্রাণ কখন কোথায় জমাবে, কে কি কাজ করবে এবং অন্তিমে কে কোথায় যাবে, অর্থাৎ বেহেস্ত না দোজখে। তিনি এ-ও জানতেন যে, কে কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। তিনি ইচ্ছা করলে ব্যভিচারীদ্বয়কে দাম্পত্যবন্ধন দান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে জারজ সন্তানদের জন্য প্রাণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। জারজ সন্তানদের প্রাণদান করেন আল্লাহ ইচ্ছা করেই। ব্যভিচার ঘটিয়ে আমি আল্লাহর সেই ইচ্ছাকেই পূরণ করি মাত্র।

“বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, শয়তান না থাকলে মানবজাতির মঙ্গল হতো। তাঁরা ভেবে দেখেননি যে, আমার নির্দেশিত পথে চলেই বর্তমান জগতের মানুষের যতো সব আয়-উন্নতি এবং তারই সাহায্যে চলছে ভালো ধর্মের বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য। আজ যদি আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই বা আমার দাগাকাজ বন্ধ করি, তাহলে মানবসমাজে যে বিপর্যয় দেখা দেবে তা থেকে রক্ষা পাবে না বিশ্বাসীরাও।

“প্রথমত কতিপয় রাষ্ট্রীয় দপ্তর থাকবে না। ফলে মন্ত্রিত্ব হারাবে অনেকে এবং রাজ্যশাসনে বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ হবে কর্মহীন। সুরশিল্পী, চিত্রশিল্পী থাকবে না, থাকবে না মাদকদ্রব্যের ব্যবসা। এছাড়া থাকবে না সুদ, ঘুষ, কালোবাজারী ইত্যাদির পেশা। আর এতে মানবসমাজে যে ভয়াবহ বেকারত্ব ও আর্থিক সংকট দেখা দেবে, তার প্রতিক্রিয়া হবে ধর্মরাজ্যেও। কেননা ঐসব অসৎবৃত্তির আয় দ্বারাই তো হচ্ছে যতো মসজিদ-মাদ্রাসার ছড়াছড়ি ও হজ্জ্বযাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি।

“কোনো কিছুর অভাব আমার নেই বা অন্য কোনো দুঃখ আমার নেই। একটিমাত্র দুঃখ এই যে, মানুষ আল্লাহকে না জানার ফলে এবং তাঁর কুদরৎ অনুধাবন করতে না পেরে অযথা আমার উপর দোষারোপ করে। আল্লাহ ইচ্ছাময় ও সুমহান। "এখন আর বেশী কথা বলার সময় নেই। নামাজের সময় হচ্ছে, মসজিদে যাই। আসসালামু আলাইকুম।”

আগন্তুক চলে গেলেন মসজিদের দিকে। কিন্তু নামাজ পড়তে না দাগ দিতে তা বুঝা গেলো না। মাইকের আজানে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো, চেয়ে দেখি পূর্ব আকাশ পরিষ্কার।

বিস্ময়বিষ্ট হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম– এতদিন আমার মনে হচ্ছিলো যে, হিন্দু পুরাণশাস্ত্রে লিখিত 'নারদ মুনি' পরবর্তিকালে শয়তান রূপ লাভ করেছেন।

উভয়ের পরিচয়পত্র মিলালে তা বেশ বুঝা যায়। হিন্দুশাস্ত্রমতে– ‘নারদ-এর মাতাপিতা নেই। সে ভগবান ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি। তার বাসস্থান ছিলো স্বর্গে এবং সে ছিলো ধার্মিক চূড়ামণি। সে সৃষ্টিকর্তার একটি আদেশ অমান্য করায় অভিশপ্ত হয়ে (মানবরূপে) পতিত হয় মর্ত্যে (পৃথিবীতে)। সে ছিলো সর্ববিদ্যাবিশারদ এবং স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষে ছিলো তার অবাধ গতি।”

সৃষ্টি, বাসস্থান, স্বর্গচ্যুতি ও গুণাবলীর বর্ণনায় নারদ এবং শয়তান দুজনের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। শয়তান যেনো নারদের একটি অভিনব সংস্করণ। তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় নয়, চতুর্থ সংস্করণ। নারদ-নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের নায়ক পার্সি ধর্মের ‘আহরিমান, তৃতীয় সংস্করণে ইহুদী ধর্মের সেদিম বা ‘দেয়াবল এবং চতুর্থ সংস্করণের নায়ক হচ্ছে শেষ জামানার শয়তান।

পূর্বেকার ঐসব অনুমান আমার হঠাৎ যেনো নস্যাৎ হয়ে গেলো। কেননা মূর্তিমান শয়তান যে আজ আমার চোখের সামনেই বসা ছিলো এতক্ষণ।

নারদ শয়তান

অনলাইনে প্রাপ্ত

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। নারদ ত্রিকালজ্ঞ, বেদজ্ঞ ও তপস্বী। নার শব্দের অর্থ জল। ইনি সবসময় তর্পণের জন্য জলদান করতেন বলে এঁর নাম হয় নারদ।

ভগবত মতে নারদ জনৈক ব্রাহ্মণের এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তাঁর মায়ের আদেশে সবসময় যোগীদের সেবা করতেন এবং এই যোগীদের উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে ধর্মপরায়ণ হয়ে উঠেন। এই সময় সাপের কামড়ে তাঁর মায়ের মৃত্যু ঘটে। এরপর ইনি তপস্যার জন্য বনে যান। নারদ মাত্র একবার ঈশ্বরের দর্শন লাভ করতে সক্ষম হন। ঈশ্বরকে পাবার জন্য আকুল চেষ্টা করেও ঈশ্বরকে ইনি দ্বিতীয় বার দর্শন করতে পারলেন না। এরপর ইনি বিভিন্ন সাধুদের সেবা করে তাঁর বুদ্ধিকে দৃঢ় করেন এবং ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থেকেই পৃথিবী ভ্রমণ করতে থাকেন। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়েই ইনি ঈশ্বরে লীন হয়ে যান।

এরপর কল্প শেষে বিষ্ণু যখন সমুদ্রের জলে শায়িত ছিলেন, তখন তাঁর নিঃশ্বাস যোগে নারদ বিষ্ণুর অন্তরে প্রবেশ করেন। বিষ্ণু তাঁর নিদ্রা ত্যাগ করে যখন সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন তাঁর ইন্দ্রিয় থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্মার মন

থেকে নারদ আবির্ভূত হন। ইনি সেই থেকে দেবদত্ত বীণায় হরি গান করে সর্বত্র ভ্রমণ করতে থাকেন।

ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণের মতে- নারদের জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার কণ্ঠ থেকে। প্রথমে ব্রহ্মা তাঁকে সৃষ্টির ভার দেন। সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত থাকলে ঈশ্বর চিন্তা বিঘ্নিত হবে বিবেচনা করে ইনি ব্রহ্মার আদেশ মানতে রাজী হলেন না। ফলে ব্রহ্মা তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, নারদকে গন্ধমাদন পর্বতে গন্ধর্বযোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। যথা সময়ে ইনি গন্ধর্বযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর নাম ছিল উপবর্হণ। এই জন্মে ইনি চিত্ররথের ৫০টি কন্যাকে বিবাহ করেন। এর পরে ইনি এক আসরে রম্ভার নাচ দেখে উত্তেজিত হলে, তাঁর বীর্যপাত হয়। এতে ব্রহ্মা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে- তাঁকে মানুষ হয়ে জন্মানোর অভিশাপ দেন। ব্রহ্মার এই অভিশাপে কলাবতী নামক এক নারীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য কান্যকুব্জের গোপরাজ দ্রুমিলের বন্ধ্যা স্ত্রী ছিলেন কলাবতী। একদিন কশ্যপ স্বর্গের অপ্সরা মেনকাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর বীর্যস্খলন হয়। কলাবতী এই বীর্য পান করে গর্ভবতী হন এবং এই গর্ভ থেকে অভিশপ্ত নারদের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণরা নারদকে ব্রহ্মার পুত্র জেনে তাঁকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এরপর তিনি বিষ্ণুর ধ্যান করতে করতে ব্রহ্মে লীন হয়ে যান।

কয়েক কল্প পরে ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ করলে আবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এইবার ইনি বীণা যোগে সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে মোহিত করা শুরু করেন। পুরাণ মতে- নারদ সর্বদাই নানা রাগ-রাগিণী যুক্ত সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। কিন্তু সবসময় তাঁর সঙ্গীতে কিছু না কিছু ত্রুটি থেকে যেতো। কিন্তু নারদ এই ত্রুটি নিজে বুঝতে পারতেন না, সেই কারণে নারদ তাঁর নিজের গান নিয়ে খুব গর্ব করতেন। নারদের এই গর্বকে খর্ব করার জন্য একবার রাগ-রাগিণীরা বিকলাঙ্গ নর-নারীর রূপ গ্রহণ করে নারদের যাত্রা পথে উপস্থিত হলেন। নারদ এই বিষয় অবগত ছিলেন না বলে- ইনি উক্ত বিকলাঙ্গ নারী-পুরুষরূপী রাগ-রাগিণীকে তাঁদেরকে

বিকলাঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তাঁরা বললেন যে, তাঁরা নারদের বিকৃত সঙ্গীতের রূপ। নারদ এই কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে, তাঁদেরকে প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গীত পরিবেশনের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তাঁরা বললেন যে, মহাদেবের গান শুনলে তাঁদের বিকলাঙ্গতা দূর হবে। এরপর নারদ মহাদেবের কাছে সঙ্গীত শোনার আবেদন জানালে- মহাদেব জানালেন যে, প্রকৃষ্ট শ্রোতা ছাড়া তিনি গান শোনাবেন না। পরে নারদ মহাদেবের পরামর্শ অনুসারে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-কে অনুরোধ করে আসরে নিয়ে আসেন। মহাদেবের গান শোনার পর রাগ-রাগিণীদের বিকলাঙ্গতা দূর হয়। এই সঙ্গীতের মর্ম ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু বিষ্ণু কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে ইনি আংশিক দ্রবীভূত হন। বিষ্ণুর এই দ্রবীভূত অংশ ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলুতে ধারণ করেন। বিষ্ণুর এই দ্রবীভূত অংশই গঙ্গা নামে খ্যাত হয়। নারদের সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করে, বিষ্ণু উলুকেশ্বর নামক এক গন্ধর্বের কাছে তাঁকে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য পাঠান।

তাঁকে বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যায়। ইনি কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত পূর্বেই কংসকে জানিয়েছিলেন, ধ্রুবের তপস্যায় মন্ত্রদাতা ছিলেন, মহাদেব-পার্বতীর বিবাহের ঘটক ছিলেন, দক্ষের অহঙ্কার নাশে ইনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। রাময়ণের মূল কাহিনী তিনি বাল্মীকিকে শুনিয়েছিলেন। পরে এই কাহিনী অবলম্বনে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। এছাড়া ইনি দূত হিসাবেও বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। নারদ কথা গোপন করে রাখতে পারতেন না। কখনো কখনো অবিবেচকের মতো কথা বলে, বিপর্যয় ডেকে আনতেন। কংসের কাছে কৃষ্ণের কাছে জন্মগ্রহণ এবং কৃষ্ণকর্তৃক কংসবধের কথা বলেছিলেন। বিন্ধ্যপর্বতের কাছে সুমেরুর গুণকীর্তন করে, পৃথিবী বিপর্যস্ত করেন। পরে এই বিপর্যয় থেকে অগস্ত্য মুনি পৃথিবী রক্ষা করেন।

মিথের শয়তান

জিসান হাসান

মানবজাতির প্ররোচনাকারী হিসেবে শয়তান নামটির সাথে আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত; আদম ও হাওয়াকে প্ররোচিত করে আব্রাহামিক ধর্মমতের আদিপাপ সংগঠনের কারণও এই শয়তান। তবে মজা হচ্ছে, বাইবেল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শয়তান সম্পর্কে আব্রাহামিক ধর্মমতের আদি দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই এমনটা নয়! শয়তান মূলত ধারাবাহিক ধর্মতাত্ত্বিক বিকাশেরই ফলাফল। শয়তান নিয়ে সাধারণ মুসলিমদের ধরানা হচ্ছে; আদমকে সেজদা করতে অস্বীকার করার বিদ্রোহ দিয়ে শয়তানের প্রাথমিক জন্ম ও গল্পের শুরু হয়, এরপর আদমকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানো এবং স্বর্গ হতে বিতাড়নের জন্যও দোষ এই শয়তানের। আমাদের জানা এই গল্প থেকে বাইবেলের আদি বর্ণনা একেবারেই আলাদা; যেখানে শয়তান নয়, আদম ও হাওয়াকে নিষিদ্ধ ফলের ফাঁদে ফেলে একটি সাপ। তাই বাইবেলীয় সৃষ্টিতত্ত্বের কিতাবে আমাদের জানা-শোনা শয়তানকে সরাসরি খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঈশ্বরের সৃষ্ট অন্য যে-কোনো জীবজন্তুর মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক; এই সাপ একদিন হাওয়া'কে বললো, "ঈশ্বর কি সত্যি তোমাদের বলেছেন, 'তোমরা বাগানের কোনো গাছ থেকে কিছু খেতে পারবে না?' হাওয়া সাপ'কে প্রত্যুত্তর দিল,

'আমরা বাগানের গাছগুলো থেকে ফল খেতে পারি; কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন, "বাগানের মাঝখানের গাছটি থেকে তোমরা ফল খেতে পারবে না, এমনকি তোমরা সেটা স্পর্শও করবে না, করলে তোমরা মারা যাবে।" এরপর সাপটি হাওয়া'কে বলল, "তুমি মৃত্যুবরণ করবে না; কেনোনা ঈশ্বর জানেন যখন তুমি এই ফল খাবে, তোমার চোখ উন্মোচিত হবে, আর তুমি ঈশ্বরের মতই হয়ে উঠবে, শুভ আর অশুভকে চিনতে শিখবে।" হাওয়া ভেবে দেখলো, গাছটির ফল খাওয়া ভাল হবে; আর এটা দেখতেও দারুণ সুন্দর, আর জ্ঞানী হবার জন্য এটি অবশ্যই আকাঙ্ক্ষিত, তখন সে এর ফল পেড়ে নিলো এবং ভক্ষণ করলো; আর সে তার স্বামীকে কিছুটা খেতে দিল, সেও তার সাথেই ছিল, আর সেও তা খেল। **(জেনেসিস ৩:১-৬)**

এই আদেশ লংঘনের ফলস্বরূপ ঈশ্বর সংশিষ্ট তিনজনকেই অভিশপ্ত করলেন; পুরুষ, নারী ও সাপ। সাপকে দেওয়া অভিশাপটি মজার: হাওয়া বললো, "সাপটি আমাকে ধোঁকা দিয়েছে, আর আমি তা ভক্ষণ করেছি।" ঈশ্বর সাপকে বললেন, "তুমি এটা করেছো বলে সকল প্রাণী আর বন্যজন্তুর মাঝে তুমি হবে অভিশপ্ত; জীবনভর পেটের ওপর ভর দিয়ে চলতে হবে তোমাকে, আর ধূলি হবে তোমার খাদ্য। আমি তোমার আর এই নারীর মাঝে, আর তোমার সন্তান ও তার সন্তানগণের মাঝেও শত্রুতা জন্মাবো; সে তোমাকে মস্তকে আঘাত করবে, আর তুমি তার গোড়ালিতে আঘাত হানবে।" **(জেনেসিস ৩:১৩-১৫)**

সাপের প্রতি অভিশাপ ছিলো, সে সাপ হয়েই জন্মাবে; কাজেই সে পেটের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ধূলিতে চলার শাস্তি প্রাপ্ত হবে এবং চিরকাল তাকে মাড়িয়ে যাওয়া হবে। এথেকে এটা স্পষ্ট, এই আলোচনা মোটেই শয়তান নিয়ে নয়, বরং নিছক সাপ নিয়েই করা হচ্ছে। সাপকে স্পষ্ট করেই একটি প্রাণী হিসেবে বলা হচ্ছে, "অন্য যে কোনো প্রাণী থেকে ধূর্ত", এখানে কোনো ফেরেস্তা বা জ্বীন বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে না। তাহলে প্রশ্ন আসে, আদমের প্ররোচনাকারী বিদ্রোহী ফেরেস্তা হিসেবে শয়তানের ধারণাটা কোথা থেকে এলো?

বাইবেলীয় সৃষ্টিতত্ত্বের গ্রন্থে একজন "বিদ্রোহী ফেরেশতা'র" গল্প আছে, মহাপ্লাবনের আগে ফেরেশতা আর মানুষের অবৈধ মিলনের কথাও বর্ণিত হয়েছে এসব গল্পে; মানুষ যখন পৃথিবীর বুকে বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো, আর তাদের কন্যারা জন্ম নিতে থাকলো, তখন ঈশ্বরের পুত্ররা দেখলো-যে তারা আকর্ষণীয়া; আর তারা তাদের মাঝ থেকে যাদের পছন্দ হতো তাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতো; তারপর প্রভু দেখলেন যে পৃথিবীর বুকে মানুষের নাফরমানী দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। **(জেনেসিস ৬:১-৪)**

মানুষের সাথে ফেরেশতাদের এই পাপপূর্ণ মিশ্রণকে সেই সব অশুভ পরিস্থিতিগুলোর একটি হিসেবে উত্থাপন করা হয়েছে যেগুলোকে ঈশ্বর মহাপ্লাবনের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাহোক, ফেরেশতাদের (ওপরে ব্যবহৃত "ঈশ্বরের পুত্র" অভিধাটি স্পষ্টতই "স্বর্গীয় আত্মাদের", অর্থাৎ ফেরেশতাদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে)। কামজর্জরিত বিদ্রোহের এই অস্পষ্ট ভাসাভাসা গল্পের সাথে যুক্ত হবার আগ পর্যন্ত শয়তানের সত্তাটি বিদ্রোহী সত্তা ছিলো বলে মনে হয়না, বরং সে ছিলো একজন ফেরেশতাই, যার দায়িত্ব ছিল মানুষকে পাপের দায়ে "অভিযুক্ত" করার ভূমিকা পালন করা। ফেরেশতাদের ওপরই কেবল এরকম দায়িত্ব অর্পণ করা যেতো, কেনোনা বনি-ইসরায়েলীদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর একটি স্বর্গীয় পরিষদ দ্বারা পরিব্যপ্ত থাকেন, অনেকটা যেমন ইসরায়েলীদের রাজারা থাকেন উপদেষ্টা-পরিবেষ্টিত।

এরকমেরই একজন স্বর্গীয় উপদেষ্টা ছিল শয়তান (হিব্রু ভাষায় **স্যাটান**, মানে 'যিনি অভিযুক্ত করেন')। দৃশ্যত তার ভূমিকা ছিলো অভিযোগ উত্থাপনকারী একজন স্বর্গীয় আইনজীবীর সমতুল্য, যিনি মানুষের অন্যায় তুলে ধরেন (এবং এভাবে তাদেরকে পাপের দায়ে "অভিযুক্ত করেন")। বাইবেলের জাকারিয়া পুস্তকে এই ভূমিকাটি স্পষ্ট করেই উল্লেখিত আছে: তারপর তিনি আমাকে দেখালেন মহা ইমাম যশুয়া প্রভুর ফেরেস্তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর শয়তান তার হাতের ডানদিকে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিযুক্ত করছে। **(জাকারিয়া ৩:১)**

অভিযোগকারী হিসেবে শয়তানের ভূমিকাকে আরও বিকশিত করার জন্য তার যুক্তিসঙ্গত বিবর্তন হলো প্রথমে মানুষকে পাপের দায়ে অভিযুক্ত করা, আর পরবর্তীতে মানুষ পাপে আকৃষ্ট হয় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ঈশ্বরকে প্ররোচিত করা এবং এভাবে তার নিজের অভিযোগকে সঙ্গত প্রমাণ করা। ঠিক এটাই ঘটেছে বাইবেলের আইয়ুব নবী সম্পর্কিত গ্রন্থটিতে।

ঈশ্বর শয়তানকে বললেন, "তুমি কি আমার বান্দা আইয়ুব-কে খেয়াল করেছো? দুনিয়ায় তার মত আর কেউ নাই, সে একজন দোষমুক্ত এবং ঋজু মানুষ যে মাবুদকে ভয় পায় এবং নাফরমানী থেকে দূরে থাকে।" তখন শয়তান উত্তর করলো, "...কিন্তু আপনি আপনার হস্ত প্রসারিত করে তার সব কিছু ধ্বংস করে দিন, তখন সে আপনাকে মুখের ওপর অভিসম্পাত দেবে।" **(আইয়ুব ১:৮ ও ১১)**

এই বাক্যবিনিময়ের ফল হলো আইয়ুব গবাদি উট এবং ভৃত্যসমেত তার সন্তানাদি সকলই হারালেন। যাহোক, আইয়ুব এই সকল পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও তার ঈমানে অটল থাকলেন। এরই ফলশ্রুতি বেহেস্তী দরবারে আরেকটি আলোচনা:

ঈশ্বর শয়তানকে বললেন, 'তুমি কি আমার ভৃত্য আইয়ুবকে খেয়াল করেছো?...সে এখনও তার একাগ্রতা ধরে রেখেছে, যদিও তুমি আমাকে তার বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছিলে যাতে আমি কোন কারণ ছাড়াই তাকে ধ্বংস করি।" **(আইয়ুব ২:৩)**

শয়তান এভাবে মানুষকে পাপাচারের দায়ে অভিযুক্ত করা থেকে অগ্রসর হয়ে আইয়ুব নবীর পর্বে মানুষকে প্ররোচিত করার জন্য ঈশ্বরকে উস্কে দিলো যাতে তার উত্থাপিত এই পাপাচারের অভিযোগ সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আদি প্ররোচক হিসেবে শয়তানের ব্যক্তিত্বটিকে ওই পর্যন্ত বাইবেলের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে কিনা আদমের পাপের জন্য তো বটেই, মানবজাতিকে পরবর্তী সকল প্ররোচনার জন্যও দায়ী। এটা বাইবেলীয় বর্ণনাগুলোর উদ্দেশ্যমূলক পুনর্লিখনের আগে ঘটেনি,

যেটি করা হয়েছিল একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার জন্য। প্রশ্নটি হল পাপের দায়ভার কার? এটা ঘটলো ওল্ড টেস্টামেন্টের স্যামুয়েল কিতাবে মুসা নবীর পশ্চাৎগমন করে মিশর থেকে বেরিয়ে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইসরায়েলী জাতির আদিতম দিনগুলোর একটি ধর্মীয় ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, আর এতে আছে নিম্নবর্ণিত এই অনুচ্ছেদটি:

আবারও ইসরায়েলীদের বিরুদ্ধে প্রভুর ক্রোধ জাগ্রত হল, আর তিনি দাউদকে তাদের বিরুদ্ধে উস্কে দিলেন এই বলে, "যাও, ইসরায়েল আর ইহুদার মানুষদের শুমারী কর।" **(স্যামুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক ২৪:১)**

বাইবেল অনুযায়ী (লোক) গণনা বা আদমশুমারীর সাধারণ উদ্দেশ্য যুদ্ধের লক্ষ্যে বাহিনী গড়ে তোলা। যুদ্ধ ও রক্তপাতের জন্য বাহিনী গড়ে তোলার কাজটিও স্যামুয়েল নবীর সেই পাপের হুঁশিয়ারীগুলোর মধ্যে একটি, যেগুলো ইসরায়েলীদের ওপরে কাউকে রাজা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলে তার দ্বারা সংঘটিত হবে।

কাজেই স্যামুয়েল প্রভুর সকল বাণী মানুষের কাছে বললেন, তারা তাঁর কাছে একজন রাজা চাইছিল; তিনি বললেন, "তোমাদের ওপর যারা রাজত্ব করবে সেই রাজাদের ধরণ হবে এই রকম: সে তোমাদের সন্তানদের নিয়ে যাবে এবং তার রথ ও ঘোড়সওয়ারীর কাজে এবং তার রথের পেছনে দৌড়ানোর কাজে তাদেরকে নিযুক্ত করবে। **(স্যামুয়েলের প্রথম পুস্তক ৮:১০-১১)**

কিন্তু বুক অব ক্রনিকলস-এ ওপরের ঐতিহাসিক বর্ণনাটির পুনর্কথন করতে গিয়ে পরবর্তীকালে একজন বাইবেলীয় গ্রন্থকার একটি ধর্মতাত্ত্বিক সঙ্কট উপলব্ধি করেন; ঈশ্বর কীভাবে দাউদ-এর পাপের জন্য দায়ী হতে পারেন? আদমশুমারী যদি সত্যিই পাপাচার হয়, তবে অবশ্যই এই পাপের দায় ঈশ্বরের নয়, তা দাউদের ওপরই বর্তায়। এটাই স্বাধীন ইচ্ছা আর পাপাচারের মধ্যবর্তী সেই প্রাচীন সমস্যা,

একেশ্বরবাদের পাটাতনে যেটা সর্বদাই উঁকি মারে; চূড়ান্তভাবে ঈশ্বর অবশ্যই এইসব কিছু ঘটানোর ইচ্ছা করেন (না-হলে ওসব ঘটতো না), কিন্তু মানুষও অবশ্যই তার নিজের পাপের জন্য দায়ী থাকবে। আধুনিক একেশ্বরবাদীরা সাধারণভাবে একমত যে, এই সমস্যাটির কোনো সন্তোষজনক সমাধান নেই; এটা সেই বিষয়গুলোর মাঝে একটি যেখানে তারা হাল ছেড়ে দিয়ে মানবজাতির নিজের কাজের দায়ভার নেবার মতো পর্যাপ্ত স্বাধীন ইচ্ছা থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করে খাঁটি যুক্তিবাদের আশ্রয় নেয়। কিন্তু এই ধর্মতাত্ত্বিক জটিলতা শেষ পর্যন্ত প্ররোচক রূপে শয়তানের এমন একটা বিকাশ ঘটালো, মানুষকে (দাউদসহ) যে অশুভের দিকে টেনে নেয়। এভাবে অশুভকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সর্বদা সম্পর্কিত রাখার জটিলতা পরিহার করা গেলো। দাউদের আদমশুমারীর সেই একই ইতিহাস বুক অব ক্রনিকলস-এ পুনর্কথিত হলো নিম্নরূপে, এবং এটাই হিব্রু বাইবেলে একমাত্র বর্ণনা যেখানে মানবজাতির পাপের জন্য শয়তানকে সত্যিকার অর্থে দায়ী করা হয়েছে:

শয়তান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে উদ্যত হলো, আর দাউদকে ইসরায়েলের আদমশুমারী করতে উস্কে দিল। **(ক্রনিকলস প্রথম পুস্তক ২১:১)**

মানবজাতির চিরস্থায়ী প্ররোচক হিসেবে শয়তানের ক্রমবিকাশ একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় তুলে ধরে; ধর্মকে একটি স্থির অপরিবর্তনীয় সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে রক্ষণশীল মুসলমানরা সাধারণত প্রথাগত ইসলামের প্রতি কঠোর আনুগত্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। শয়তানের ইতিহাসের উপরিউক্ত বিশ্লেষণ কিন্তু দেখায় যে শয়তানের ধর্মীয় বয়ানের মতোই ইসলামের ধর্মীয় বয়ানও সময়ের প্রেক্ষিতে বহু পরিবর্তনের ফসল। এটা ধর্মকে গতিশীল হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমর্থন করে, যা একটি সত্য হিসেবে সময়ের ধারায় বিবর্তিত হয়, ঠিক যেমন হয়েছে শয়তানের চরিত্রটিও।

হিব্রু বাইবেলে শয়তানের সংক্ষিপ্ত উপস্থিতির পর্যবেক্ষণ এটাই দৃশ্যমান করে যে, আদমকে পাপে প্ররোচনাদানকারী বিদ্রোহী ফেরেশতা হিসেবে শয়তানের পূর্ণ ভূমিকা ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছে। ইহুদী বাইবেলে শয়তানকে আদম-হাওয়া গল্পের সর্প চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি, সেখানে ওটা স্রেফ একটা সাপই। অথবা শয়তানকে প্রত্যক্ষভাবে লালসাপূর্ণ ফেরেশতাদেরও তালিকাভুক্ত করা হয়নি, যারা মহাপ্লাবনের পূর্বে মানবীদের গর্ভবতী করেছিল; যেটি বাইবেলের একমাত্র বর্ণনা যাকে ফেরেশতাদের বিদ্রোহ বলা চলে। বহু শতাব্দী ধরে শয়তানকে দৃশ্যত নালিশ উত্থাপনকারীর ভূমিকা পালনরত ঈশ্বরের অনুগত ভৃত্যদের একজন হিসেবেই গণ্য করা হত, যে মানব জাতির পাপগুলো ধরিয়ে দিত; তাইতো তার উপাধি অভিযোগ-উত্থাপনকারী। কেবলমাত্র পরবর্তীতেই সে মানুষকে পাপের দায়ে অভিযুক্তকারীর ভূমিকা থেকে তাদেরকে পাপে প্ররোচনাদানকারী রূপে বিবর্তিত হয়, এটা এমন একটা পরিবর্তন স্পষ্টতই যা ঘটলো ঈশ্বরকে বুক অব ক্রনিকলস-এর ইসরায়েলী রাজাদের পাপাচারের দায় থেকে মুক্ত করার বাসনায়।

বাইবেল-উত্তর ইহুদী রচনাতেই কেবল আদম ও হাওয়াকে যে প্ররোচিত করেছিল এবং মানব-নারীদের যারা গর্ভবতী করেছিল সেই বিদ্রোহী ফেরেশতাদের মাঝে একটি যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছিলো। এনখ-এর প্রথম পুস্তকে এই উভয় অপরাধই বিদ্রোহী ফেরেশতাদের অন্যায় কাজের মাঝে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যদিও শয়তান নামটি তখনও ব্যবহৃত হয়নি।

দ্বিতীয়জনের নাম ছিল **আসবেল**; সে ছিল তাদের মাঝে একজন যে স্বর্গীয় ফেরেস্তাদের সন্তানদের অশুভ পরামর্শ দিল এবং তাদেরকে অসৎ পথে পরিচালিত করলো, যাতে তারা তাদের দেহকে মানব-কন্যাদের দ্বারা কলুষিত করে। তৃতীয় জনের নাম ছিল **গাদেরেল**; এই হলো সে যে ঈভকে কুপথে চালিত করেছিল। **(ইনখ-এর প্রথম পুস্তক ৬৯:৬)**

একজন ফেরেশতা কেন ঈভকে বিপথগামী করবে এই প্রশ্নটা রয়েই গেল; এই সঙ্কটটির নিরসন করা হয়েছিল শয়তানের আদমকে সেজদা করতে অস্বীকার করার গল্পটি উদ্ভাবন করে, যে গল্পটি প্রথম দৃশ্যমান হয় আদম ও ঈভ-এর বাইবেল পরবর্তী জীবনচরিত থেকে:

শয়তান উত্তর দিল, ...'প্রভু ঈশ্বর বললেন, 'আদম, শ্রবণ করো। আমি তোমাকে বানিয়েছি আমাদের আদল আর আকৃতিতে।' এবং জিবরায়েল বাইরে গেলেন এবং সকল ফেরেস্তাদের ডেকে বললেন, 'প্রভু ইয়াহইয়ের আকৃতিকে ভজনা কর।' আর আমি বললাম ...'আমি আমা হতে হীনতর এবং অর্বাচীন কাউকে ভজনা করব না...তার সৃষ্টির পূর্বেই আমি সৃষ্ট হয়েছি। তার উচিত আমাকে ভজনা করা।' ...আর প্রভু ঈশ্বর আমার ওপর ক্রোধান্বিত হলেন এবং আমার ফেরেস্তাদের সাথে আমাকে আমাদের গৌরব থেকে বঞ্চিত করলেন; ...কাজেই আমি তোমার স্ত্রীকে প্রতারণাপূর্বক অভিভূত করেছি এবং তোমাদের বহিষ্কার ঘটিয়েছি ...যেমন আমি নিজেই বহিষ্কৃত হয়েছি।" **(আদম ও ঈভের জীবনচরিত, ১৩-১৬)**

একবার এটা যখন করা গেল, তখন শয়তানকে বেহেস্তের সেই প্ররোচক সাপের সাথে একাকার করাটা খুব সহজ একটা পদক্ষেপ মাত্র। কাহিনীটির প্রাচীনতম সংস্করণগুলোতে সাপটি এখনও কেবলমাত্র একটা সাপই, এবং সে নিজেও এই প্রতারণাটি করার জন্য শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত।

এবং শয়তান সর্পকে উদ্দেশ্য করে বলল, এই কথা, "...আমি শুনেছি তুমি সকল পশু হতে জ্ঞানী ...তুমি কেন বেহেস্তের ফলগুলো বাদ দিয়ে আদমের আগাছাগুলো ভক্ষণ করো? ওঠো এবং অগ্রসর হও, আর চলো তার স্ত্রীর মাধ্যমে আমরা তাকে স্বর্গোদ্যান থেকে বিতাড়ন করি, যেমনটি আমরা তার মাধ্যমে বিতাড়িত হয়েছি... আমার অনুগত হও, আর আমি তোমার মুখ দিয়ে এমন শব্দ উচ্চারণ করি যার সাহায্যে তুমি তাকে প্রতারিত করতে সক্ষম হবে।" **(আদম ও ঈভের জীবনচরিত, ১৬)**

খ্রিস্টান নিউ টেস্টামেন্টের সময় নাগাদ শয়তানের প্ররোচক ভূমিকাটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(যিশু) চল্লিশ দিবস যাবত মরুভূমিতে ছিলেন, শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত অবস্থায়। **(মার্ক-এর সুসমাচার, ১: ১৩)**

সুসমাচার এবং বাইবেল-পরবর্তী ইহুদী প্রথার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই কোরানে শয়তানের জন্য প্ররোচক বিদ্রোহী রূপে একটি পূর্ণবিকশিত ভূমিকা রয়েছে। এখানে শয়তানকে উল্লেখ করা হয়েছে দুটি নামবাচক বিশেষ্য দ্বারা; হিব্রু "শয়তান" শব্দের আরবী রূপ শাইতান, এবং ইবলিশ, যা খুব সম্ভবত ডেভিল শব্দটির গ্রীক রূপের আরবী (ডায়াবোলোস) সংকোচন, শব্দটি হয়তো-বা বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ ব্যবহারকারী ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আরবে নিয়ে এসেছিল। কোরানে শয়তানের চিত্রণসম্বলিত সুরাগুলোর দিকে আমরা এবার নজর দিতে পারি:

নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে বানিয়েছি কাদামাটির একটি ছাঁচ দিয়ে, আর আগেই জ্বিন বানিয়েছি আগুনের শিখা থেকে। আর যখন মাবুদ ফেরেস্তাদের বললেন, 'দেখো, আমি কাদামাটির ছাঁচ দিয়ে মাটির তৈরি এক নশ্বর জীব সৃষ্টি করছি। আমি যখন তার আকৃতি দিয়ে ফেলবো, আর আমার আত্মাকে তার ভেতর ভরে দেব, তখন তোমরা উপুড় হয়ে তার সামনে নতজানু হবে!' তারপর সেই ফেরেস্তারা সকলেই নিজেদের নতজানু করল, কেবল ইবলিশ ছাড়া; সে নতজানু হওয়াদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতে রাজি হল না। তিনি বললেন, 'ইবলিশ, তোমার সমস্যাটা কি, যে তুমি নতজানুদের মাঝে নেই?' সে বলল, 'আমি নিজেকে কখনোই একজন নশ্বরের সামনে নতজানু করব না যাকে আপনি কাদামাটির একটি ছাঁচে মাটি দিয়ে বানিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি এখান থেকে চলে যাও; তুমি অভিশপ্ত। তোমার উপর এই অভিশাপ বহাল থাকবে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত।'...সে বলল, 'প্রভু, যেহেতু আপনি আমাকে কলুষিত করছেন আমিও তাদের ভাল সবকিছুকে ধুলিসাৎ করবো,

আর আমি তাদের কলুষিত করবো, তাদের সকলকে; কেবল আপনার বান্দাদের মাঝে তাদের ছাড়া যারা উৎসর্গপ্রাণ।' **(কোরান ১৫:২৬-৪০)**

আর আমরা বললাম, 'আদম, তুমি এবং তোমার সঙ্গিনী এই বাগানের অধিকারী হও এবং যা খুশি ভক্ষণ কর, কিন্তু এই বৃক্ষের কাছে এসো না, যাতে তোমরা নাফরমানদের অন্তর্ভুক্ত না হও।' তখন শয়তান তাদের কাছে তাদের নিজেদের শরীরের যে লজ্জাকর অংশ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে উন্মোচিত করার জন্য তাদের গোপনে ফুসলানো শুরু করল। সে বলল, 'তোমাদের মাবুদ এই বৃক্ষ থেকে তোমাদের বিরত রেখেছেন যাতে তোমরা ফেরেস্তাদের মত না হতে পার, অথবা তোমরা যেন অমর না হয়ে যাও।' আর সে প্রতিজ্ঞা করে বলল, 'সত্যি সত্যিই আমি তোমাদের একজন নিষ্ঠাবান পরামর্শক।' এভাবে সে তাদের বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করল; আর যখন তারা বৃক্ষটির ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাকর অংশ তাদের কাছে উন্মোচিত হয়ে পড়ল, কাজেই তারা নিজেদের দেহ উদ্যানের পাতা দিয়ে আবৃত করল। অতঃপর তাদের মাবুদ তাদেরকে ডেকে পাঠালেন, 'আমি কী তোমাদের জন্য এই বৃক্ষ নিষিদ্ধ করিনি, আর বলিনি, "নিশ্চিতভাবেই শয়তান তোমাদের ঘোষিত শত্রু?" **(কোরান ৭:১৮-২৩)**

শয়তানের উপরোক্ত ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিকে তাকালেই এর পেছনকার অভিলাষটি স্পষ্ট হয়; শয়তান তার বর্তমান ভূমিকাটি গ্রহণ করেছে, কেননা ঈশ্বরকে দায়ী না-করেই পাপের ব্যাখ্যা দিতে হবে। ঈশ্বরের কাছ থেকে পাপের দায়ভার গ্রহণ না-করা পর্যন্ত শয়তানের পৌরাণিক চরিত্রটি বহু শতাব্দী ধরে বিস্তৃত হয়েছে, এবং কোরানও এই ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছে। এই পৌরাণিক ভাষার খুঁটিনাটি বহু শতাব্দীব্যাপী ইহুদী প্রথার বিকাশেরই ফল যা কোরান তার নিজের ইতিহাস হিসেবেই আত্মীকৃত করেছে।

আদম, ঈভ ও সাপের গল্পটির উৎস যেখানে আদিতম বাইবেলীয় বর্ণনার দলিল ("জে" উৎস হিসেবে অভিহিত, কেননা এতে ঈশ্বরের প্রাচীন ইসরায়েলীয় নাম 'জিহোভা' অথবা হিব্রুতে 'ইয়াহওয়ে' ব্যবহৃত হয়েছে) এবং সম্ভবত এটা ১২০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ইসরায়েলীদের একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের সমবয়সী। শয়তানের পূর্ণতর বাইবেলীয় বিকাশ ঘটেছিল অ্যাপোক্যালিপটিসিজম-এর প্রেক্ষিতে, এটি একটি ধর্মীয় আন্দোলন; খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকে ইহুদীদের মাঝে যে আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছিল।

একটি জটিল আন্দোলন হলেও অ্যাপোক্যালিপটিসিজমকে দেখা যায় ঈশ্বরের সাথে ইব্রাহিম ও মুসা নবীর চুক্তির ব্যর্থতার ব্যাখ্যা হিসেবে। ঈশ্বরের সাথে ইসরায়েলী জাতির আদি সমঝোতাটি ছিল ধর্মের একটি জাগতিক, গোত্রগত বোঝাপড়া যাতে এই শর্তের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল যে, ইসরায়েল ইহাহওয়ের উপাসনা করলে পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে একটি জনবহুল ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করা হবে। যাহোক, ইসরায়েল ও ইহুদা রাজ্য অ্যাসিরিয়া ও ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক খ্রিস্টপূর্ব ৮ম ও ৬ষ্ঠ শতকে অধীনস্থ হবার পর ইসরায়েলী স্বাধীনতা আর কখনো পুনরার্জিত হয়নি, ফলে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কের নতুন বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

অ্যাপোক্যালিপটিসিজম একটি সমাধান পেশ করেছিল; পৃথিবীতে জাগতিক শক্তিগুলোর সাথে ইসরায়েলীদের সংগ্রাম হচ্ছে স্বর্গে ঈশ্বর ও বিদ্রোহী ফেরেশতাদের লড়াইয়েরই প্রতিফলন, কাজেই স্বর্গীয় লড়াইটি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জাগতিক লড়াই নিষ্পন্ন হবার আশা করা যায় না। অ্যাপোক্যালিপটিসিজম-এর প্রয়োজন ছিল একটি বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের, যে ঈশ্বরের বিরোধিতা করবে; এবং শয়তানের মাঝে তারা সেই ব্যক্তিত্বটিকে পেল, যাকে মানবজাতির গোটা ইতিহাস জুড়ে পাপের জন্য দায়ভার দেয়া হলো। অ্যাপোক্যালিপটিসিজম ইহুদীবাদে আরও অনেক গুরুতর বদল নিয়ে আসে, বিশেষতঃ এই বিশ্বাস যে একটি "বিচার দিবস" আসবে যা ঐশী ও

জাগতিক এই উভয় লড়াইয়ের সমাপ্তি চিহ্নিত করবে; একই রকমভাবে জন্ম হলো মৃত্যুপরবর্তী জীবনের, যার প্রয়োজন ছিল নিষ্ঠাবান ইহুদীদের পুরস্কৃত করার জন্য, কেননা তাদেরকে জীবদ্দশায় একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী ইসরায়েলী জাতি উপহার দেয়াটা আর হচ্ছে না; কিন্তু এগুলো ভিন্ন প্রসঙ্গ।

জরুরী উপলব্ধি হলো কোরানে শয়তানের ব্যাপারটি জটিল একটি ধর্মতাত্ত্বিক বিকাশের চূড়ান্ত পরিণতি। আদম ও শয়তান এবং স্বর্গোদ্যান হতে বিতাড়নের ব্যাপারটি কোরানের বিশ্ববীক্ষায় কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে। এই বিবরণ নিজেই কালে কালে বিবর্তিত হয়ে ঐশীবাণীর অপরিবর্তনীয়তার পরিবর্তে কালে কালে তার পরিবর্তনশীলতার ধারণাকেই সমর্থনের প্রবণতা দেখায়।

গত দুই দশকে ইসলাম-সম্পর্কিত শিরোনামগুলোর মাঝে সবচেয়ে বেশী স্থান জুড়ে ছিল সালমান রুশদীর “স্যাটানিক ভার্সেস” এর প্রকাশ। কিন্তু রুশদী বিরোধী যে তুমুল গণ-বিক্ষোভ ঘটলো তার একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো এটি রুশদীর গ্রন্থের সবচেয়ে গূরুত্বপূর্ণ দিকটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে গিয়েছে; সেটা হলো এই যে “শয়তানী আয়াত” (অর্থাৎ কোরানীয় সেই সুরাগুলি, যা সাময়িককালের জন্য মক্কার পৌত্তলিক দেবীদের কয়েকজনকে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়েছিল বলে যা পরে বাতিল হয়েছে) এর বিবরণ সম্পূর্ণই নবীর একজন মুসলিম জীবনীকার আল-তাবারীর কাজের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। আল-তাবারীর ঐতিহাসিক বর্ণনার বিশ্লেষণ ইসলামে শয়তান ও ঐশীবাণীর পূর্ণতার উপলব্ধিকে সম্ভবপর করবে।

প্রথমত সেই ঐতিহাসিক বর্ণনাটিই দেখা দরকার, এটির বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ আল-তাবারী:

যখন আল্লাহর নবী দেখলেন কীভাবে তাঁর গোত্র তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহর কাছ থেকে তিনি তাদের জন্য যে বার্তা নিয়ে এসেছেন তা পরিহার করছে, তিনি ব্যথিত হলেন, তাঁর অন্তর থেকে তিনি চাইলেন যে আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর কাছে এমন কিছু আসুক যা তাঁর গোত্রের সাথে তাঁর বিরোধ নিষ্পন্ন করবে। নিজ গোত্রের জন্য তাঁর ভালবাসা এবং তাদের মঙ্গলের জন্য তাঁর ব্যাকুলতার কারণে তাঁর পথে তাদের তৈরি করা বাধাগুলোর কিছুটা প্রশমিত করা গেলে তাঁর জন্য তা পরমানন্দের হতো, আর নিজের সাথেই তিনি বিতর্ক করলেন এবং অন্তর থেকে তেমন একটি ফলাফল বারংবার কামনা করলেন। তারপর আল্লাহ প্রকাশ করলেন এই বাণী: "ঐ তারকার নামে যখন সেটি অস্ত যায়...", আর যখন তিনি এই শব্দগুলোয় পৌঁছুলেন "তুমি কি বিবেচনা করেছো আল-লাত এবং আল উজ্জা আর মানাত, যিনি তৃতীয় জন?", তখন শয়তান তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং তাঁর নিজের লোকদের তিনি যা শোনাবার আকাঙ্ক্ষা করতেন তার সুযোগ নিয়ে তাঁর জিহ্বায় ভর করে এই শব্দগুলো বসিয়ে দিল, "ঊর্ধ্বাকাশে উড্ডীয়মান ওইসব সারসরা; তাদের উপাসনা পূর্ণরূপেই অনুমোদিত"... তারপরই জিব্রাইল আল্লাহর নবীর কাছে এলেন এবং বললেন, "মুহাম্মদ, এটা আপনি কি করলেন? আল্লাহর কাছ থেকে আমি এমন কথা আনিনি, যা আপনি লোকেদের কাছে উচ্চারণ করেছেন; এবং আপনাকে বলা হয়নি এমন কথা আপনি লোকেদের বলেছেন।" আল্লাহর নবী তখন খুবই ব্যথিত হলেন এবং আল্লাহকে দারুণ ভয় করলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর কাছে একটি ঐশীবাণী পাঠালেন (কোরান, ২২:৫২) কেননা তিনি তাঁর প্রতি ছিলেন ক্ষমাশীল **(দি হিস্ট্রি অব আল-তাবারী, ডব্লিউ এম ওয়াট এবং এম ভি ম্যাকডোনাল্ড কর্তৃক অনূদিত, খ - ৬, পৃ ১০৮-১০৯)।**

এই বর্ণনার প্রামাণিকতা কেবল ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে বিচার করাটা কঠিন। নবীর আদিতম জীবনীগ্রন্থটি হলো ইবনে ইসহাক-এর, কিন্তু পৃথক একটি পাণ্ডুলিপি হিসেবে এটি আর অস্তিত্বশীল নেই। তাঁর টিকে-থাকা প্রধান দুটো জীবনী ইবনে হিশাম ও আল তাবারীর, দুটিরই লেখকদের দাবি তা তাদের মালিকানায় থাকা

ইবনে ইসহাক-এর অনুলিপির ওপর ভিত্তি করে রচিত; কিন্তু আল-তাবারীর জীবনীগ্রন্থটিতে উপরোক্ত "শয়তানী সুরা" পর্বটি অন্তর্ভুক্ত হলেও ইবনে হিশামেরটিতে তা অনুপস্থিত। পশ্চিমা পণ্ডিতরা সকলেই আল-তাবারীর পক্ষাবলম্বন করেছেন, তাঁদের বিশ্বাস এই যে, ওটা ঐ সময়ে সাধারণভাবে গ্রাহ্য না হয়ে থাকলে তাঁর পক্ষে এমন একটি বিতর্কিত অধ্যায় ঢুকিয়ে দেয়াটা অসম্ভব হতো; মুসলমানরা ইবনে হিশামের পক্ষাবলম্বন করে পুরো ঘটনাটিকেই অস্বীকার করেছেন, একমাত্র ব্যতিক্রম খ্যাতনামা পাকিস্তানী পণ্ডিত ফজলুল রহমান, ফজলুল রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এবার আমরা সেই আয়াতগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি আল-তাবারী যেগুলোকে দেখিয়েছেন "শয়তানী আয়াতগুলো"-র প্রতিস্থাপক হিসেবে:

তোমরা কি আল-লাত এবং আল উজ্জা আর মানাত, যিনি তৃতীয়জন, এদের কথা বিবেচনা করছো? ...তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের যে নামে ডেকেছো, তারা সেই নামের বাইরে আর কিছুই না; মাবুদ তাদের ওপর কোন কর্তৃত্ব আরোপ করেননি, ...আকাশমণ্ডলে-তো কত ফেরেস্তাই আছে যাদের উপাসনা কোন ফলই বয়ে আনবে না, কেবল মাবুদই যাদের ওপর সন্তুষ্ট হন তাঁদেরকে ইচ্ছা প্রদান করেন। যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেস্তাদের সাথে (ওইসব) নারীদের নামের শরণ নেয়। **(কোরান ৫৩:২০-২৯)**

এ কারণেই কোরানে মক্কার তিন দেবীর সাথে আপোসের কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই। এই ঘটনার প্রধান বিষয় হলো নবী প্ররোচিত হয়েছেন এবং আসল আয়াতগুলোকে স্বয়ং পরিবর্তন করে মক্কাবাসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সংস্করণ তৈরি করেছেন। এই পর্বটি মূলগতভাবে নবীর নৈতিক ব্যর্থতা বিষয়ক, আর শয়তান কোরানের একটি ঐশী বাণীর সূত্র ধরে কেবল পরবর্তীকালেই এই দৃশ্যে প্রবেশ করে, এবং এভাবে এটা আল-তাবারীর বর্ণনার সত্যতার পক্ষেই আরও নিদর্শন হাজির করে:

আমরা তোমার আগে এমন কোন বার্তাবাহক বা পয়গম্বর পাঠাইনি, শয়তান যার আকাঙ্ক্ষায় ভর করেনি, যখন সে তেমন আকাঙ্ক্ষা করত; কিন্তু শয়তান যা করায় মাবুদ তা বাতিল করেন, তারপর মাবুদ তার চিহ্ন সন্দেহাতীতভাবেই নিশ্চিত করেন; ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী; শয়তান যা বলায় তাকে তিনি দুর্বলচিত্তদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ ব্যবহার করেন... **(কোরান ২২:৫২)**

আর তাবারীর বর্ণনার পক্ষে কোরানে এমনকি আরও বেশী সাক্ষ্য রয়েছে, যদি আমরা ধরে নেই যে অন্য আয়াত দ্বারা 'রহিত'-হওয়া আয়াতগুলো সত্যিকারার্থে "শয়তানী আয়াত" অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত।

আর আমরা যে আয়াতই রহিত করি কিংবা বিস্মৃত করি না কেনো, আমরা তার তুলনায় উৎকৃষ্ঠ বা সমতুল্য অন্য কিছু আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে-আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব সকল কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত? **(কোরান: ২-১০০)**

আল-তাবারীর বর্ণনার একটি কৌতূহলোদ্দীপক দিক হলো এই গুরুত্বারোপ যে, শয়তান নবীর হৃদয়ে মিথ্যা আয়াত ভরে দিতে পারছে "তাঁর অন্তর্গত দ্বিধা"র কারণেই। ঘটনাটির এমন একটি ব্যাখ্যা শয়তান-বিষয়ক এই উপলব্ধির সাথে মেলে যেখানে শয়তান পাপপ্রবণতার ব্যক্তিচরিত্রায়ন। কোরান শয়তানকে জ্বিন হিসেবে চিহ্নিত করে শয়তানের আক্ষরিক ব্যাখ্যার বদলে তার একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পক্ষে আরও একটি যৌক্তিকতা দান করে:

আর যখন আমরা ফেরেস্তাদের বললাম, 'আদমের সামনে নতজানু হও'; তখন ইবলিশ ব্যতীত সকলেই নতজানু হল; সে ছিল জ্বিনদের একজন, আর সে তার মাবুদের হুকুমের বিরুদ্ধে প্রভুদ্রোহী হল। **(কোরআন ১৮:৫০)**

'জ্বিন' বস্তুত একটি ইসলাম-পূর্ব শব্দ যা ব্যবহৃত হয় এমন একটি অদৃশ্য সত্তাকে বোঝাতে যে মানুষের সাথে কথা বলত, এমনকি তাকে নির্বুদ্ধিতার দশাগ্রস্ত

করতে সক্ষম (সে কারণেই উন্মাদনা বোঝাতে আরবীতে মাজনুন শব্দটি ব্যবহৃত হয়, এর আক্ষরিক অর্থ 'জ্বিনের আছর লাগা')। শয়তান/ইবলিশ এখানে তাই অযৌক্তিক আকুতি যা নবীর মানবিক দুর্বলতা এবং মক্কাবাসীদের সাথে আপসের জন্য মরিয়া তাগিদ থেকে অঙ্কুরিত হয়েছে, এবং তাঁকে দিয়ে "শয়তানী আয়াতগুলো" ঐশীবাণীর মাঝে ঢুকিয়ে দিতে পরিচালিত করেছে। পয়গম্বররাও মানুষ এবং সে কারণেই তাঁদের ত্রুটি হতে পারে, কোরানের এই বারংবার গুরুত্বারোপের আলোকে বিশ শতকের মুসলিম পণ্ডিত ফজলুল রহমান "শয়তানী আয়াতসমূহ" অধ্যায়টির সত্যতা মেনে নিতে কোনো সমস্যাই দেখেন না। তাঁর মতে:

কিন্তু আপসের যে আশঙ্কা বা চিন্তা-এমন কি ইঙ্গিতও নবী করে থাকুন না কেন, সেগুলো দ্রুতই আল্লাহ "রহিত"করেন কিংবা "মুছে দেন", যেমনটা ২২:৫২ আয়াতে পরিষ্কার বলা আছে। পৌত্তলিক দেবীদের কথা একবার উল্লেখ করে (৫৩:১৯-২০) নবী তাদেরকে "উচ্চস্তরের রাজহংস যাদের সাথে (আল্লাহর) মোলাকাত আশা করা যায়"...রূপে বর্ণনা করেই ৫৩:২১-২৩-এ এই কথাগুলো রহিত করে ফেলার ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, কেননা ঘটনাটি তাঁর সাহাবীদের বিচার ও শাস্তিপ্রদানের দুর্যোগপূর্ণ একটি সময়ে ঘটেছিল, যাঁদেরকে তিনি সাময়িকভাবে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতেও হুকুম দিয়েছিলেন। এমন আরও লক্ষণ আছে যে নির্দিষ্ট কিছু আয়াত অন্যান্যগুলো কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হয়েছিল: ২:১০৬, ১৩:৩৯, ১৬:১০১...। কোরানের হিসেবে কিন্তু এমন একজন পয়গম্বরের জন্য এটা বিস্ময়করও নয়, ধারার বাইরেও নয় কিংবা দোষেরও নয়, মানুষ হিসেবে তিনি ভুল করতেই পারেন। এরপরও কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ হিসেবেই তিনি মানবজাতির জন্য একজন আদর্শে পরিণত হন, কেননা তাঁর সাধারণ আচার-আচরণের মান এসত্ত্বেও এতটাই উচ্চমানের যে তা মানবজাতির জন্য মূল্যবান আদর্শস্বরূপ; কোরানে এমন প্রচুর উদাহরণ আছে যেখানে নবী কোনো সময়ে যখন আশা করছেন ঘটনাপ্রবাহ কোনো একটা নির্দিষ্ট পথে এগুবে, আল্লাহর ঐশীবাণী তখন সম্পূর্ণ ভিন্নপথে অগ্রসর

হলো। “পূর্বানুমানবশতঃ চকিতে আপনার জিহবাকে ঐশীবাণীর সমভিব্যহারে (অর্থাৎ আগেই) অগ্রসর করবেন না। একে একত্রে নিয়ে আসা এবং আবৃত্তি করা আমাদের দায়িত্ব, কজেই আমরা যখন তা আবৃত্তি করব, আপনি কেবল তা অনুসরণ করবেন” (৭৫:১৬-১৯) **(ফজলুর রহমান, মেজর থিমস ইন দি কোরআন, পৃ ৮৮-৯০)**

তাহলে রক্ষণশীল মুসলিমদের বড় অংশই কেন আল-তাবারীর ‘শয়তানের আয়াত’ অধ্যায় নিয়ে আলাপ করতে সাধারণত গররাজী? মনে হয় এর সোজাসাপ্টা কারণ এই যে, এটা নবীর পক্ষেও ভ্রম করা সম্ভব এবং নিজগোত্রকে পক্ষে আনার জন্য তাঁর মানবিক ঝোঁক কোরানকে সাময়িকভাবে হলেও বিকৃত করতে পারে-এমন একটি চিত্র হাজির করে। আরও জরুরি বিষয় হলো, ইসলামি আইনের বিশাল অংশটি দাঁড়িয়ে আছে নবীর জীবন ও শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে। কাজেই যার খাঁটি ঐশী প্রকাশ হবার কথা, সেটাই যদি নবীর ভ্রমশীলতার শিকার হতে পারে, তবে হাদিসের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা আরও বেশি, কেননা এগুলো তো আল্লাহ্‌র বাণী নয়, প্রত্যক্ষভাবে নবীরই কথা। রদকরণ সম্পর্কে কোরআনের আয়াতগুলোকে বস্তুত দেখা যেতে পারে ঐশীপ্রকাশের বিশুদ্ধতার ঐশী নিশ্চয়তা হিসেবে; নবীর ভ্রমশীলতা সত্ত্বেও আল্লাহ কোরানের সঠিকত্ব নিশ্চিত করলেন অ-সঠিক আয়াতগুলোকে প্রতিস্থাপিত করে। যা হোক, হাদিসের জন্য এমন কোনো রদকরণের নিশ্চয়তা নেই। রক্ষণশীলরা হাদিস ও ইসলামী আইন বিষয়ে এমন প্রশ্ন উত্থাপন করাকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেন।

তাহলে রুশদীর বইটি নিয়ে এত শোরগোল কেন? বেঁচে থাকলে আল-তাবারী নিজেও কি কতলযোগ্য হতেন, যদিও তাঁর নিজের সময়ে এই প্রশ্নটি আদৌ ওঠেনি? এর উত্তরটার সাথে সম্ভবত আল-তাবারীর সম্পর্ক সামান্যই, বরং এর সম্পর্ক বেশী আয়াতুল্লাহ খোমেনির সাথেই, যিনি রুশদীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে রুশদীর বইটি বেশীরভাগ মুসলিম রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় অধিকাংশ মুসলমানই খোমেনির প্রতি রুশদীর এই মর্মভেদী বিদ্রূপটি পড়ার

সুযোগ পাননি যেটিতে আক্ষরিক অর্থেই একজন মোল্লা হিসেবে তিনি ফেরেশতা জিব্রাইলের পিঠে চড়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রুশদীর ব্যঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় স্রেফ খোমেনির ক্রোধই যদি এই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ডেকে আনে, তবে সারা দুনিয়ার মুসলমানরাই দুর্ভাগ্যজনক একটা অহমের দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছেন।

সমাপ্ত

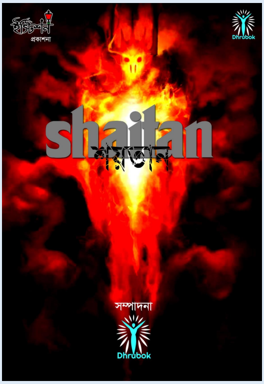

আব্রাহামিক ধর্মমতে শয়তান একটি মজাদার চিন্তাশীল উপাদান; একক সৃষ্টিকর্তার আপাত মন্দ কাজের দায়ভার এড়াতে, ধর্ম শুরুর প্রারম্ভেই শয়তান নামক মিথের জন্ম দেওয়া হয়েছে। একজন বিশ্বাসী মানুষ কোনো রকম প্রাথমিক যুক্তি জ্ঞান ছাড়াই শয়তান উপাখ্যানে আস্থা রাখেন এবং শয়তানের ওপর তার মন্দ কাজের দায়ভার চাপিয়ে সুখবোধ করেন।

শয়তান মিথের ধর্মতাত্ত্বিক উৎপত্তি নিয়েই এই ইবুকটির জন্ম; এই সংকলনে আব্রাহামিক ধর্মমতের শয়তানকে এমনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যা আপনার চিন্তার অন্ধকারে থাকা শয়তানকে চিনতে সাহায্য করবে।

ইস্টিশন
একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.blog
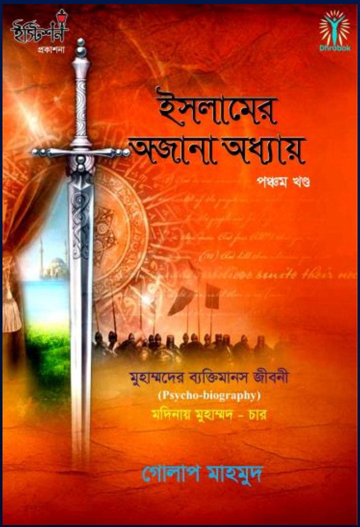
সংগ্রহ করুন আজই